

ନବମ ଶ୍ରେଣି | ଜୀବବିଜ୍ଞାନ

ଅଧ୍ୟାୟ ୬: ଜୀବେ ପରିବହନ





প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

'Preparation Book' টি সম্পূর্ণ সঠিক এবং ত্রুটিহীন রাখার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কেউ কোন ভুল দেখতে পাও, তাহলে নিচে দেয়া ফর্মের লিংকে ক্লিক করে, সেখানে তোমার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য দিয়ে আমাদের জানালে আমরা কৃতজ্ঞ হবো এবং খুব শীঘ্রই সেটি সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ্।
তাছাড়া প্রিপারেশন বুক সংক্রান্ত যেকোনো পরামর্শ বা উপদেশও দিতে পারো এই ফর্মে!

শুভ কামনায়

ACS Future School

ফর্মটিতে যেতে,

ক্লিক করো

অথবা,



QR Code টি Scan করো

অধ্যায় ৬: জীবে পরিবহণ

মৌলিক আলোচনা

উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক

পানি জীবনের জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান। উদ্ভিদকোষের জীবন্ত অংশ প্রোটোপ্লাজমের প্রায় ৯০ ভাগই হলো পানি। পানি ছাড়া উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। প্রোটোপ্লাজমকে সজীব রাখতে এবং উদ্ভিদের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন: সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, শোষণ, পরিবহন, বৃদ্ধি ইত্যাদি) সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পানির গুরুত্ব অপরিমিত। উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলরোমের সাহায্যে প্রধানত পানি শোষণ করে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

জীবনের জন্য পানির অপরিহার্যতা বলে শেষ করা যায় না। উদ্ভিদজীবনে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো:

১. প্রোটোপ্লাজমের সজীবতা রক্ষা: কোষের প্রোটোপ্লাজমকে সজীব ও সক্রিয় রাখতে পানির বিকল্প নেই। প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৯০ ভাগই পানি। পানির পরিমাণ কমে গেলে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে যায়, যা কোষের স্বাভাবিক কাজে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায় এবং এর ফলে উদ্ভিদ মারাও যেতে পারে।

২. দ্রাবক হিসেবে কাজ: পানি একটি চমৎকার দ্রাবক। উদ্ভিদ মাটি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় শোষণ করে। এই দ্রবীভূত খনিজ লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ (যেমন: শর্করা) পানি দ্বারা বাহিত হয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে (পাতা, কাণ্ড, মূল, ফুল, ফল) পরিবাহিত হয়।

৩. শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া পরিচালনা: উদ্ভিদের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যেমন - সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন, প্রস্বেদন ইত্যাদি পানির উপর নির্ভরশীল।

সালোকসংশ্লেষণ: এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের পাশাপাশি পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল। পানি ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না, ফলে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

প্রস্বেদন: উদ্ভিদ তার দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে বের করে দেয়, যাকে প্রস্বেদন বলে। প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ দেহ ঠান্ডা থাকে এবং মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে একটি টান সৃষ্টি হয়।

৪. কোষের দৃঢ়তা ও আকার প্রদান: পানি কোষকে রসস্বীত (Turgid) রাখে। কোষরসস্বীতির ফলে কোষ দৃঢ়তা লাভ করে এবং উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন: পাতা, কচি কাণ্ড) সতেজ ও খাড়া থাকে। পানির অভাবে কোষগুলো শিথিল হয়ে পড়ে এবং উদ্ভিদ নেতিয়ে যায়, যা আমরা প্রায়শই দেখি শুকনা বা গরমকালে গাছের পাতা নুয়ে পড়তে।

৫. বৃদ্ধি ও চলনে ভূমিকা: কোষ বিভাজন ও কোষের আকার বৃদ্ধির জন্য পানি অপরিহার্য। পানির চাপ কোষপ্রাচীরে চাপ দেয়, যা কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়া কিছু উদ্ভিদের চলনেও (যেমন: বনচাঁড়ালের পাতার ত্রিফলকের পার্শ্বপত্রকের ওঠানামা) পানির ভূমিকা রয়েছে।

উদ্ভিদের পানি শোষণ প্রক্রিয়া:

উদ্ভিদ প্রধানত মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। উদ্ভিদ সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ক্রিয়ার মাধ্যমে পানি শোষণ করে থাকে। প্রক্রিয়া তিনটি হলো:

ক) ইমবাইবিশন (Imbibition)

খ) ব্যাপন (Diffusion)

গ) অভিশ্রবণ (Osmosis) (এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে তোমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানবে)

(ক) ইমবাইবিশন (Imbibition):

এটি একটি বিশেষ ভৌত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কলয়েডধর্মী (আঠালো বা জেলির মতো) শুকনা বা আংশিক শুকনা পদার্থ তরল পদার্থ (বিশেষ করে পানি) শুষে নেয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, কোষপ্রাচীর এবং প্রোটোপ্লাজম কলয়েডধর্মী হওয়ায় পানি শোষণ করতে পারে। কলয়েডধর্মী পদার্থগুলো হলো পানিগ্রাহী বা হাইড্রোফিলিক (Hydrophilic)। উদ্ভিদের মধ্যে সেলুলোজ, স্টার্চ, জিলাটিন ইত্যাদি হলো পানিগ্রাহী কলয়েড পদার্থ। এরা তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে তা শুষে নেয় এবং এর ফলে পদার্থটি কিছুটা ফুলে ওঠে।

উদাহরণ: বর্ষাকালে বা ভেজা পরিবেশে শুকনা কাঠের দরজা বা জানালার কাঠ পানি শোষণ করে কিছুটা ফুলে ওঠে এবং আটকাতে কষ্ট হয়। এটি ইমবাইবিশনের একটি পরিচিত উদাহরণ। একইভাবে, পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ছোলা বা মুগ ডালের বীজ পানি শোষণ করে ফুলে ওঠে।

(খ) ব্যাপন (Diffusion):

একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অণুগুলো (কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়) তাদের বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকার দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় স্থানের ঘনত্ব সমান না হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অণুগুলোর গতিশক্তির কারণেই ব্যাপন ঘটে।

উদাহরণ: ঘরের এক কোণে সেন্টের শিশি খুললে বা কোনো সুগন্ধি ফুল রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা ঘরে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এটি গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপনের উদাহরণ। এক গ্লাস পানিতে চিনির বা লবণের কণা ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণ পর তা আপনাআপনি পুরো পানিতে মিশে যায় (যদিও নাড়াচাড়া করলে দ্রুত হয়)। এটি কঠিন পদার্থের তরলে ব্যাপনের উদাহরণ।

ব্যাপন চাপ (Diffusion Pressure): ব্যাপনকারী পদার্থের অণুগুলোর গতিশক্তির জন্য এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয়, একে ব্যাপন চাপ বলে। বেশি ঘনত্বের দ্রবণে ব্যাপন চাপ বেশি এবং কম ঘনত্বের দ্রবণে ব্যাপন চাপ কম থাকে।

ব্যাপন চাপ ঘাটতি (Diffusion Pressure Deficit - DPD): একই দ্রাবক ও দ্রবের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের ব্যাপন চাপের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি বা সংক্ষেপে DPD বলে। একে চোষক চাপও (Suction Pressure) বলা হয়। এই চাপের ফলেই মূলত কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে (অথবা বলা যায়, বেশি পানি থেকে কম পানির দিকে) দ্রাবক (যেমন: পানি) ধাবিত হয়, যা অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি। কোষের পানি শোষণে এর গুরুত্ব অপরিমীম।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- উদ্ভিদকোষের জীবন্ত অংশ প্রোটোপ্লাজমের প্রায় ৯০%

পানি, তাই জীবনের জন্য পানি অপরিহার্য। (উদাহরণ: সজীব উদ্ভিদ কোষ)

- পানি একটি উৎকৃষ্ট দ্রাবক, যা খনিজ লবণ পরিবহনে সাহায্য করে। (উদাহরণ: মূল থেকে পাতায় লবণ পরিবহন)
- পানি কোষের রসস্ফীতি বজায় রেখে উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সতেজতা দেয়। (উদাহরণ: গাছের খাড়া পাতা)
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরিতে পানি অত্যাবশ্যিকীয় উপাদান। (উদাহরণ: সবুজ পাতার খাদ্য তৈরি)
- পানি উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং কিছু ক্ষেত্রে চলনে সহায়তা করে। (উদাহরণ: বীজের অঙ্কুরোদগম)
- উদ্ভিদ মূলত ইমবাইবিশন, ব্যাপন ও অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে।
- ইমবাইবিশন হলো কলয়েডধর্মী শুকনা পদার্থের পানি শোষণ প্রক্রিয়া। (উদাহরণ: শুকনা কাঠের পানি শোষণ)
- ব্যাপন হলো পদার্থের অণুর বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ছড়িয়ে পড়া। (উদাহরণ: সেন্টের গন্ধ ছড়ানো)
- ব্যাপন চাপ ঘাটতি (DPD) বা চোষক চাপ কোষের পানি শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পার্থক্য:

নিচের ছকে ইমবাইবিশন ও ব্যাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

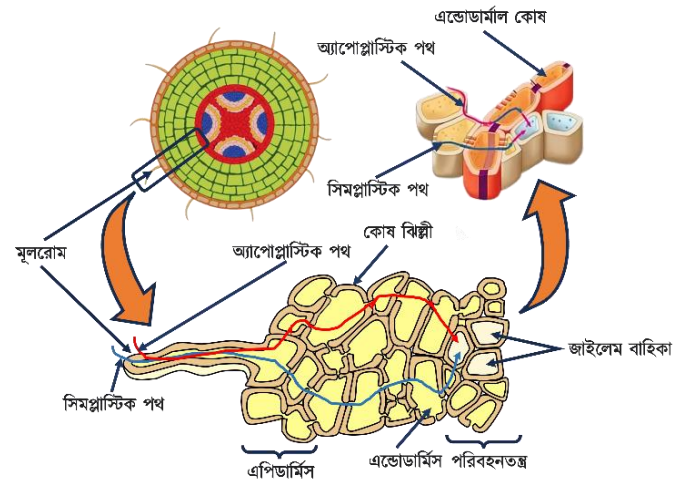
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	ইমবাইবিশন (Imbibition)	ব্যাপন (Diffusion)
প্রক্রিয়ার প্রকৃতি	এটি একটি বিশেষ ধরনের ব্যাপন, যা কলয়েড পদার্থে ঘটে।	এটি পদার্থের (কঠিন, তরল, গ্যাসীয়) অণুর স্বাভাবিক চলাচল প্রক্রিয়া।
মাধ্যম	কলয়েডধর্মী শুকনা বা অর্ধশুকনা পদার্থ	যেকোনো মাধ্যম হতে পারে (কঠিন, তরল, গ্যাসীয়); সাধারণত দুটি

	(শোষক) ও পানি।	ভিন্ন ঘনত্বের এলাকা প্রয়োজন।
অণু চলাচল	পানি (তরল) কলয়েড পদার্থের (কঠিন) অন্তঃস্থলে শোষিত হয়।	পদার্থের অণুগুলো (দ্রাব বা দ্রাবক) বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে চলাচল করে।
শক্তির মুক্তি	এ প্রক্রিয়ায় তাপশক্তি উৎপন্ন হতে পারে।	সাধারণত তাপশক্তি উৎপন্ন হয় না।
চাপ সৃষ্টি	ইমবাইবিশন চাপ (Imbibitional Pressure) সৃষ্টি হয়।	ব্যাপন চাপ (Diffusion Pressure) সৃষ্টি হয়।
প্রভাবক	পদার্থের প্রকৃতি (কলয়েডের ধরন), তাপমাত্রা, শোষকের ঘনত্ব।	অণুর ঘনত্ব, তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, অণুর আকার।
উদ্ভিদে উদাহরণ	কোষ প্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক পানি শোষণ, বীজ ফুলে ওঠা।	কোষের মধ্যে গ্যাস বিনিময় (O_2 , CO_2), পাতা থেকে জলীয় বাষ্প নির্গমন (প্রস্বেদন)।
জীবিত কোষের শর্ত	জীবিত বা মৃত উভয় কোষেই ঘটতে পারে (যেমন: মৃত কাঠের পানি শোষণ)।	মূলত অণুগুলোর ভৌত ধর্ম, জীবিত কোষের প্রয়োজন নেই, তবে জীবের শারীরবৃত্তীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্ভিদের পানি শোষণ (Water Absorption in Plants)

উদ্ভিদের পানি শোষণ হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদ

মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ করে। এই কাজটি মূলত উদ্ভিদের মূল দ্বারা সম্পাদিত হয়, বিশেষ করে মূলের অগ্রভাগে থাকা অসংখ্য সূক্ষ্ম মূলরোমের মাধ্যমে। উদ্ভিদ মাটি থেকে কৈশিক পানি (Capillary water) শোষণ করে এবং এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ভৌত প্রক্রিয়ার (যেমন: অভিশ্রবণ, ব্যাপন) সমন্বয়ে ঘটে।



চিত্র: পানি শোষণ ও পরিবহন

বিস্তারিত বর্ণনা:

উদ্ভিদের বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি এবং সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ সচল রাখার জন্য পানি অপরিহার্য। উদ্ভিদ এই প্রয়োজনীয় পানি মাটি থেকে তার মূলের সাহায্যে শোষণ করে। নিচে এই শোষণ প্রক্রিয়াটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. শোষণের স্থান: উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগের কাছাকাছি অবস্থিত এককোষী মূলরোম (Root hair) অঞ্চলই হলো পানি শোষণের প্রধান স্থান। মূলরোমগুলো হলো মূলের ত্বক বা এপিডার্মিসের কোষের বর্ধিত অংশ, যা মাটির কণার ফাঁকে থাকা পানির সংস্পর্শে আসে এবং শোষণের জন্য বিশাল ক্ষেত্রফল তৈরি করে।

২. শোষিত পানি: উদ্ভিদ মাটি থেকে বিভিন্ন প্রকার পানির মধ্যে মূলত কৈশিক পানি (Capillary water) শোষণ করতে পারে। কৈশিক পানি হলো মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে লেগে থাকা পানির স্তর।

৩. শোষণ প্রক্রিয়া: পানি শোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া যা মূলত অভিশ্রবণ (Osmosis) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এতে ব্যাপন

চাপ ঘাটতি (DPD) এবং প্রস্বেদনের (Transpiration) টানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মূলরোমে প্রবেশ: মাটির কণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি এবং মূলরোমের কোষের ভেতরের কোষরস (Cell sap)-এর মধ্যে ঘনত্বে পার্থক্য থাকে। সাধারণত, মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব মাটির পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হয় (অর্থাৎ মূলরোমের কোষে পানির ঘনত্ব কম থাকে)। মূলরোমের কোষপ্রাচীর (ভেদ্য) ও কোষ পর্দা (বৈষম্যভেদ্য) ভেদ করে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি মূলরোমের কোষে প্রবেশ করে। কোষপ্রাচীর প্রথমে ইমবাইশন প্রক্রিয়ায় পানি শুষ্ক নিতে পারে।

কোষ থেকে কোষে পরিবহন: মূলরোম থেকে পানি তার পার্শ্ববর্তী কর্টেক্স (Cortex) অঞ্চলের কোষগুলোতে প্রবেশ করে। এটি কোষ থেকে কোষে অভিশ্রবণ (Cell to cell osmosis) পদ্ধতিতে ঘটে। অর্থাৎ, একটি কোষ থেকে তার পাশের কোষে পানির স্থানান্তর ঘটে কারণ দুটি কোষের মধ্যে পানির ঘনত্বের (বা ব্যাপন চাপ ঘাটতির) পার্থক্য থাকে। পানি সবসময় কম ঘনত্বের দ্রবণ (বেশি DPD) থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের (কম DPD) দিকে ধাবিত হয়। এভাবে পানি মূলরোম → ত্বক → কর্টেক্স → অন্তত্ব (Endodermis) → পরিচক্র (Pericycle) কোষসত্তরগুলো পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে।

পরিবহন কলায় (জাইলেমে) প্রবেশ: পরিচক্র পার হয়ে পানি সবশেষে মূলের কেন্দ্রে অবস্থিত পরিবহন কলাগুচ্ছের (Vascular bundles) জাইলেম (Xylem) কলায় পৌঁছায়। জাইলেম হলো ফাঁপা নলের মতো কোষ দ্বারা গঠিত যা পানি পরিবহনের জন্য বিশেষায়িত।

উর্ধ্বমুখী পরিবহন: জাইলেম কলায় পৌঁছানোর পর পানি উদ্ভিদের উপরের অংশে অর্থাৎ কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এবং পাতায় পরিবাহিত হয়। এই উর্ধ্বমুখী পরিবহন মূলত প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট টান (Transpiration pull) এবং পানির অণুর সমসংযোগ (Cohesion) ও অসমসংযোগ (Adhesion) বলের দ্বারা ঘটে থাকে। প্রস্বেদনের ফলে পাতা থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়, ফলে জাইলেম কলার মধ্যে পানির একটি টান বা চোষক শক্তির সৃষ্টি হয় যা মূল থেকে পানিকে

উপরের দিকে টেনে তুলতে সাহায্য করে।

সম্পৃক্ত প্রক্রিয়া:

পানি শোষণ ও পরিবহনের সাথে দুটি প্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত:

- **অভিশ্রবণ:** মাটি থেকে মূলরোমে এবং মূলের এক কোষ থেকে অন্য কোষে পানি প্রবেশে মূল ভূমিকা পালন করে।
- **প্রস্বেদন:** পাতার মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাওয়ার ফলে যে টান সৃষ্টি হয়, তা পানি শোষণে এবং জাইলেমের মাধ্যমে তা উপরে পরিবহনে সাহায্য করে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- উদ্ভিদ প্রধানত মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে কৈশিক পানি শোষণ করে।
- মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব মাটির পানির চেয়ে বেশি হওয়ায় অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি মূলরোমে প্রবেশ করে।
- পানি কোষ থেকে কোষে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলরোম থেকে কর্টেক্স হয়ে মূলের কেন্দ্রস্থ জাইলেম কলায় পৌঁছায়।
- **পানি শোষণের পথ:** মাটি → মূলরোম → ত্বক → কর্টেক্স → অন্তত্ব → পরিচক্র → জাইলেম।
- প্রস্বেদন প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে পানি শোষণে সাহায্য করে, কারণ এর ফলে সৃষ্ট টান পানিকে মূল থেকে উপরের দিকে টেনে নেয়।
- পানি শোষণ মূলত অভিশ্রবণ এবং ব্যাপন চাপ ঘাটতি (DPD) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া।
- জাইলেম কলার মাধ্যমে শোষিত পানি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে (কাণ্ড, পাতা) পরিবাহিত হয়।

উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ

খনিজ লবণ শোষণ হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ উপাদান মাটি থেকে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ খনিজ লবণ কঠিন অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে না, বরং মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আয়ন (ion) হিসেবে শোষণ করে। যদিও পানির সাথে মূলরোম দিয়ে কিছু লবণ শোষিত হয়, মূলের অগ্রভাগের

কোষ বিভাজন অঞ্চলই প্রধান শোষণ অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পানি যেমন অপরিহার্য, তেমনি বিভিন্ন খনিজ লবণও অত্যাৱশ্যক। উদ্ভিদ মাটি থেকে এই খনিজ লবণগুলো সংগ্রহ করে।

১. শোষণের রূপ: উদ্ভিদ মাটি থেকে খনিজ লবণগুলো সরাসরি কঠিন অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে না। প্রথমে এই লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে আয়নে (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ) পরিণত হয়। উদ্ভিদ এই আয়নগুলোকেই শোষণ করে।

উদাহরণ: উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট (NO_3^-) বা অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) আয়ন হিসেবে; পটাশিয়াম গ্রহণ করে পটাশিয়াম আয়ন (K^+) হিসেবে; ফসফরাস গ্রহণ করে ফসফেট (PO_4^{3-} বা HPO_4^{2-}) আয়ন হিসেবে।

২. শোষণের স্থান: মূলের অগ্রভাগে অবস্থিত তরুণ অঞ্চল, বিশেষ করে যেখানে কোষ বিভাজন সক্রিয়ভাবে ঘটে, সেই অঞ্চলই খনিজ লবণ শোষণের জন্য প্রধান স্থান। মূলরোমের মাধ্যমে পানি শোষণের সময় কিছু লবণ আয়ানিক অবস্থায় শোষিত হলেও, সক্রিয় শোষণ মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ দ্বারাই বেশি হয়ে থাকে।

৩. শোষণ পদ্ধতি: উদ্ভিদ প্রধানত দুটি উপায়ে খনিজ লবণ শোষণ করে:

(ক) নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive Absorption):

- এটি এমন একটি শোষণ প্রক্রিয়া যেখানে খনিজ লবণ বা আয়ন শোষণের জন্য উদ্ভিদের কোনো বিপাকীয় শক্তির (Metabolic energy) প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়ায় ATP (শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি) খরচ হয় না।
- পার্শ্ববহুয়ের তথ্য অনুযায়ী, মূলরোম ইমবাইবিশন ও অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় যেভাবে পানি শোষণ করে, সেভাবে কিছু খনিজ লবণও শোষণ করতে পারে। এটি মূলত ভৌত প্রক্রিয়া, যেমন ব্যাপন (Diffusion) বা আয়ন বিনিময় (Ion exchange) এর মাধ্যমে ঘটতে পারে, যেখানে আয়নগুলো তাদের ঘনত্বের নতিমাত্রা (Concentration

gradient) বরাবর অর্থাৎ বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে পরিবাহিত হয়। পানির টানের সাথে কিছু আয়নের চলাচলও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

- এই পদ্ধতিতে শোষিত লবণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম।

(খ) সক্রিয় শোষণ (Active Absorption):

- এটি এমন একটি শোষণ প্রক্রিয়া যেখানে খনিজ লবণ বা আয়ন শোষণের জন্য উদ্ভিদের কোষকে বিপাকীয় শক্তি (সাধারণত ATP) খরচ করতে হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় এই শক্তি উৎপন্ন হয়।
- এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপরীতেও (অর্থাৎ কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে) প্রয়োজনীয় খনিজ আয়ন শোষণ করতে পারে। মাটির দ্রবণে কোনো আয়নের ঘনত্ব কোষের ভিতরের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হলেও, উদ্ভিদ সক্রিয় শোষণের মাধ্যমে সেই আয়নকে গ্রহণ করে কোষের ভিতরে জমা করতে পারে।
- কোষ পর্দার কিছু বাহক প্রোটিন (Carrier protein) এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা নির্দিষ্ট আয়নকে সনাক্ত করে এবং শক্তি ব্যবহার করে কোষের ভিতরে বা বাইরে পরিবহন করে।
- উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খনিজ লবণই এই প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- উদ্ভিদ মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ আয়ন (K^+ , NO_3^- ইত্যাদি) হিসেবে শোষণ করে।
- মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চল খনিজ লবণ শোষণের প্রধান স্থান।
- খনিজ লবণ শোষণ প্রধানত দুটি উপায়ে ঘটে: নিষ্ক্রিয় শোষণ ও সক্রিয় শোষণ।
- নিষ্ক্রিয় শোষণে (Passive absorption) বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না; এটি ভৌত প্রক্রিয়া (যেমন: ব্যাপন) দ্বারা চালিত হয়।
- সক্রিয় শোষণে (Active absorption) বিপাকীয় শক্তি

(ATP) প্রয়োজন হয়, যা শ্বসন থেকে আসে।

- সক্রিয় শোষণ ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপরীতেও ঘটতে পারে এবং এর মাধ্যমেই উদ্ভিদ বেশিরভাগ খনিজ লবণ শোষণ করে।

পার্থক্য:

নিচের ছকে নিষ্ক্রিয় শোষণ ও সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive Absorption)	সক্রিয় শোষণ (Active Absorption)
বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন	কোনো বিপাকীয় শক্তির (ATP) প্রয়োজন হয় না।	বিপাকীয় শক্তির (ATP) প্রয়োজন হয়।
ঘনত্বের নতিমাত্রা	সাধারণত ঘনত্বের নতিমাত্রা অনুসারে (বেশি থেকে কম ঘনত্বে) ঘটে।	ঘনত্বের নতিমাত্রার বিপরীতে (কম থেকে বেশি ঘনত্বে) ঘটতে পারে।
নির্ভরতা	কোষের শ্বসন বা বিপাকীয় কার্যকলাপের উপর সরাসরি নির্ভরশীল নয়।	কোষের শ্বসন ও বিপাকীয় কার্যকলাপের উপর সরাসরি নির্ভরশীল (শক্তির জন্য)।
বাহক প্রোটিন	বাহক প্রোটিনের ভূমিকা অপরিহার্য নয় (তবে সুগম ব্যাপনে প্রয়োজন হতে পারে)।	প্রায়শই নির্দিষ্ট বাহক প্রোটিনের প্রয়োজন হয়।
প্রক্রিয়ার উদাহরণ	ব্যাপন, আয়ন বিনিময়, সীমিত পরিমাণে ইমবাইশন/অভিশ্রবণের সাথে সংশ্লিষ্ট।	আয়ন পাম্প, বাহক-মধ্যস্থ পরিবহন।
শোষণের হার	তুলনামূলকভাবে ধীর এবং কম লবণ শোষিত হয়।	তুলনামূলকভাবে দ্রুত এবং বেশি লবণ শোষণ সম্ভব।

উদ্ভিদ পরিবহন - পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন এবং কোষরসের আরোহণ

- **উদ্ভিদ পরিবহন:** উদ্ভিদদেহে প্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন - মূল দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণ এবং পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল বা বহন করার প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদ পরিবহন বলে।
- **পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন:** উদ্ভিদ কর্তৃক মূল দিয়ে শোষিত পানি ও তাতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ মূল থেকে কাণ্ড ও পাতার উর্ধ্বমুখে পরিবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পানি ও খনিজ পদার্থের পরিবহন বা রসের উৎস্রোত (Translocation of water and minerals) বলে। এটি মূলত জাইলেম কলার মাধ্যমে ঘটে।
- **কোষরসের আরোহণ (Ascent of Sap):** মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণকে একত্রে কোষরস বা সংক্ষেপে রস (Sap) বলে। এই কোষরস বা স্যাপ জাইলেম কলার মাধ্যমে অভিকর্ষের বিপরীতে উপরের দিকে অর্থাৎ উদ্ভিদের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পাতায় বাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে কোষরসের আরোহণ বা অ্যাসেন্ট অব স্যাপ বলে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য পরিবহন একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। মূল মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে, যা উদ্ভিদের সকল সজীব কোষে পৌঁছানো প্রয়োজন, বিশেষ করে পাতায় যেখানে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি হয়। আবার, পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদের অন্যান্য জীবন্ত অংশে যেমন - কাণ্ড, মূল, ফল, বীজ ইত্যাদিতে সরবরাহ করা অপরিহার্য। এই দ্বিমুখী চলাচলই হলো পরিবহন।

পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা:

১. পানি ও খনিজ লবণ পাতায় সালোকসংশ্লেষণের জন্য এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য। মূল থেকে এই উপাদানগুলো পাতায় পৌঁছানোর জন্য পরিবহন দরকার।
২. পাতায় উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের প্রতিটি সজীব কোষে (মূল, কাণ্ড, ফুল, ফল) শক্তি উৎপাদন ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। তাই

পাতা থেকে এই খাদ্য বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিবহন অপরিহার্য।

৩. পরিবহন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কাজ ব্যাহত হয়, পুষ্টির অভাব ঘটে এবং অবশেষে উদ্ভিদ মারা যায়।

পরিবহন কলা:

উদ্ভিদের পরিবহনের কাজটি মূলত দুটি বিশেষ ধরনের জটিল কলা বা টিস্যুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

জাইলেম (Xylem): এটি প্রধানত পানি ও খনিজ লবণ মূল থেকে উপরের দিকে পাতায় পরিবহন করে (উর্ধ্বমুখী পরিবহন)।

ফ্লোয়েম (Phloem): এটি পাতায় তৈরি শর্করা জাতীয় খাদ্য (সুকরোজ রূপে) উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে (নিচের দিকে মূল বা উপরের দিকে ফল/ফুল) পরিবহন করে (মূলত নিম্নমুখী, তবে প্রয়োজনে উর্ধ্বমুখীও হতে পারে)।

কোষরসের আরোহণ (Ascent of Sap):

এটি পানি ও খনিজ লবণ পরিবহনের প্রধান অংশ।

প্রক্রিয়া: মূলরোম দিয়ে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ (অর্থাৎ কোষরস) প্রথমে মূলের জাইলেম কলায় পৌঁছায়। সেখান থেকে কাণ্ডের জাইলেম কলার মাধ্যমে অভিকর্ষের টান উপেক্ষা করে উপরের দিকে পরিবাহিত হয়ে শাখা-প্রশাখা ও অবশেষে পাতায় পৌঁছায়। এমনকি অনেক উঁচু গাছের (যেমন: তাল, নারিকেল, শাল) শীর্ষেও পানি পৌঁছায় এই প্রক্রিয়ায়।

পথ: মূলরোম → মূলের কটেক্স → মূলের জাইলেম → কাণ্ডের জাইলেম → শাখার জাইলেম → পাতার জাইলেম (শিরা)।

কার্যকারণ (Mechanism): কোষরসের আরোহণের জন্য মূলত কয়েকটি শক্তি সম্মিলিতভাবে কাজ করে:

- **প্রস্বেদন টান (Transpiration Pull):** পাতা থেকে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে জাইলেম বাহিকার মধ্যে পানির একটি টান বা ঋণাত্মক চাপের সৃষ্টি হয়। এই টানই পানিকে উপরে টেনে তোলার প্রধান শক্তি।
- **পানির সমসংযোগ বল (Cohesion):** পানির অণুগুলো একে অপরের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে (হাইড্রোজেন

বন্ধনের মাধ্যমে)। একে সমসংযোগ বল বলে। এর ফলে জাইলেমের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন পানির স্তম্ভ তৈরি হয়।

- **পানির অসমসংযোগ বল (Adhesion):** পানির অণুগুলো জাইলেম বাহিকার (কোষপ্রাচীর) এর সাথে লেগে থাকার প্রবণতা দেখায়। একে অসমসংযোগ বল বলে। এটি পানির স্তম্ভকে অভিকর্ষের টানের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে সাহায্য করে।
- **মূলজ চাপ (Root Pressure):** মূলের কোষগুলোতে পানি প্রবেশের ফলে এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয়, যা পানিকে কিছুটা উপরের দিকে ঠেলে দিতে সাহায্য করে। তবে উঁচু গাছে পানি তোলার জন্য এটি যথেষ্ট নয়।

এই সম্মিলিত শক্তির প্রভাবেই কোষরস জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে অভিকর্ষের বিপরীতে শত শত ফুট উপরে উঠে যেতে পারে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- উদ্ভিদ পরিবহন হলো পানি, খনিজ লবণ ও খাদ্য দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলাচল।
- জাইলেম কলার মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ (কোষরস) মূল থেকে পাতায় উর্ধ্বমুখে পরিবাহিত হয়।
- ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে পাতায় তৈরি খাদ্য দেহের বিভিন্ন অংশে (মূলত নিম্নমুখে) পরিবাহিত হয়।
- মূল থেকে পাতায় জাইলেম কলার মাধ্যমে কোষরসের উর্ধ্বমুখী পরিবহনকে কোষরসের আরোহণ (Ascent of Sap) বলে।
- কোষরসের আরোহণ প্রস্বেদন টান, পানির সমসংযোগ ও অসমসংযোগ বলের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে ঘটে।
- পরিবহন উদ্ভিদের জীবনধারণ, বৃদ্ধি ও শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য অপরিহার্য।

পার্থক্য:

নিচের ছকে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন প্রক্রিয়ার মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	জাইলেম বাহিত পরিবহন (Xylem Transport)	ফ্লোয়েম বাহিত পরিবহন (Phloem Transport)
পরিবাহিত পদার্থ	পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ (কোষরস বা Sap)।	পাতায় তৈরি শর্করা জাতীয় খাদ্য (সুকরোজ), হরমোন, অ্যামিনো এসিড ইত্যাদি।
পরিবহনের দিক	সর্বদা উর্ধ্বমুখী (মূল থেকে পাতা)।	প্রধানত নিম্নমুখী (পাতা থেকে মূল বা সঞ্চয়ী অঙ্গ), তবে প্রয়োজনে উর্ধ্বমুখীও (যেমন: মুকুল বা ফলে) হতে পারে।
প্রধান পরিবহন কলা	জাইলেম ভেসেল (Vessel) ও ট্রাকিড (Tracheid) (মৃত কোষ)।	সিভনল (Sieve tube) ও সঙ্গীকোষ (Companion cell) (জীবিত কোষ)।
প্রধান চালিকা শক্তি	প্রস্বেদন টান, সমসংযোগ ও অসমসংযোগ বল, মূলজ চাপ।	চাপের প্রবাহ (Pressure flow) বা মাস ফ্লো (Mass flow), যা শক্তির উপর নির্ভরশীল।
প্রক্রিয়ার প্রকৃতি	মূলত ভৌত প্রক্রিয়া, সরাসরি শক্তির প্রয়োজন কম (পরোক্ষভাবে প্রস্বেদনের জন্য লাগে)।	সক্রিয় প্রক্রিয়া, শক্তির (ATP) প্রয়োজন হয় (লোডিং ও আনলোডিং এর জন্য)।

সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন ও ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন

- **সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন:** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ অংশে (প্রধানত পাতায়) যে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়, তা উদ্ভিদের বিভিন্ন সজীব অংশে (যেমন: মূল, কাণ্ড, ফল, ফুল, সঞ্চয়ী অঙ্গ) সরবরাহ বা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের পরিবহন বলে।
- **ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন:** এটি উদ্ভিদ পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার মাধ্যমে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য (প্রধানত সুকরোজ রূপে) ফ্লোয়েম (Phloem) নামক বিশেষ পরিবহন কলার মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে (উৎস থেকে গ্রাহক বা Sink-এ) পরিবাহিত হয়।

বিস্তারিত বর্ণনা:

আমরা জানি, সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। পাতায় অবস্থিত ক্লোরোফিল সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং মূল দ্বারা শোষিত ও জাইলেম বাহিত পানি ব্যবহার করে শর্করা জাতীয় খাদ্য (গ্লুকোজ, যা পরে সুকরোজে রূপান্তরিত হয়) তৈরি করে। এই উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের নিজের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ যেমন শ্বসন (শক্তি উৎপাদন), বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য অপরিহার্য।

উৎপন্ন খাদ্যের ব্যবহার ও সঞ্চয়:

পাতায় উৎপন্ন খাদ্যের কিছু অংশ সেখানেই ব্যবহৃত হয়। বাকি অংশ উদ্ভিদের প্রতিটি সজীব কোষে শ্বসন ও অন্যান্য বিপাকীয় কাজের জন্য প্রেরিত হয়। উদ্ভিদের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য তার দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চয়ী অঙ্গগুলো হতে পারে:

ফল: যেমন - আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি।

মূল: যেমন - মিষ্টি আলু, মূলা, গাজর ইত্যাদি।

কাণ্ড: যেমন - গোল আলু (টিউবার), আদা (রাইজোম), পেঁয়াজ (বাল্ব) ইত্যাদি।

পাতা: যেমন - ঘৃতকুমারী (অ্যালোভেরা)।

যেখানে খাদ্য উৎপন্ন হয় (সাধারণত পাতা) তাকে উৎস (Source) এবং যেখানে খাদ্য ব্যবহৃত বা সঞ্চিত হয় (যেমন মূল, ফল, বর্ধনশীল অংশ) তাকে গ্রাহক বা সিঙ্ক (Sink) বলা হয়।

ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পরিবহন:

পাতায় উৎপন্ন এই খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবহনের কাজটি করে ফ্লোয়েম কলা।

ফ্লোয়েম কলার গঠন: ফ্লোয়েম একটি জটিল কলা, যা চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত:

- **সিভনল বা সিভ টিউব (Sieve Tube):** এরা লম্বা, নলাকার কোষ, যা একটির পর একটি সজ্জিত হয়ে খাদ্য পরিবহনের জন্য একটি দীর্ঘ পথ তৈরি করে। দুটি কোষের মধ্যবর্তী অনুপ্রস্থ প্রাচীরটি চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত হয়, যাকে সিভ প্লেট (Sieve plate) বলে। পরিণত সিভনলে নিউক্লিয়াস থাকে না।
- **সঙ্গীকোষ (Companion Cell):** প্রতিটি সিভনল কোষের পাশে একটি বা একাধিক সঙ্গীকোষ ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। এতে ঘন সাইটোপ্লাজম ও সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস থাকে এবং এটি সিভনলের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, বিশেষ করে খাদ্য লোডিং ও আনলোডিং-এ।
- **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem Parenchyma):** খাদ্য সঞ্চয় ও পার্শ্বীয় পরিবহনে সাহায্য করে।
- **বাস্ট ফাইবার বা ফ্লোয়েম ফাইবার (Bast Fibre):** উদ্ভিদ অঙ্গকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে।

পরিবহনের দিক: জাইলেমের পরিবহন (পানি) সর্বদা উর্ধ্বমুখী হলেও ফ্লোয়েমের পরিবহন (খাদ্য) সাধারণত নিম্নমুখী হয় (পাতা থেকে মূলে), তবে এটি প্রয়োজন অনুসারে উর্ধ্বমুখীও (যেমন পাতা থেকে ফুল, ফল বা বর্ধনশীল কচি পাতায়) হতে পারে। অর্থাৎ, ফ্লোয়েমের পরিবহন মূলত উৎস (Source) থেকে গ্রাহকের (Sink) দিকে হয়।

পরিবহন প্রক্রিয়া: সিভনলের সিভ প্লেটের ছিদ্রগুলো দিয়ে দ্রবীভূত খাদ্য (সুকরোজ) সহজেই এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলাচল করতে পারে। সঙ্গীকোষ এই চলাচলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এটি একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া, যার জন্য

শক্তির প্রয়োজন হয়। শীতকালে সিভ প্লেটের ছিদ্রে ক্যালাস (Callose) নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়ে পথ কিছুটা রুদ্ধ করে দেয়, ফলে খাদ্য চলাচল ব্যাহত হয় বা কমে যায়। গ্রীষ্মকালে এই ক্যালাস গলে যাওয়ায় খাদ্য চলাচল আবার স্বাভাবিকভাবে বা দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- পাতায় সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন শর্করা জাতীয় খাদ্য ফ্লোয়েম কলার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
- খাদ্য উদ্ভিদের উৎস অঙ্গ (যেমন: পাতা) থেকে গ্রাহক অঙ্গে (যেমন: মূল, ফল, কাণ্ড, বর্ধনশীল অংশ) পরিবাহিত হয়।
- ফ্লোয়েম কলার প্রধান পরিবহনকারী কোষ হলো সিভনল, যাকে সঙ্গীকোষ সহায়তা করে।
- সিভনলের কোষগুলো সিভ প্লেট দ্বারা যুক্ত থাকে, যা খাদ্য চলাচলে সাহায্য করে।
- ফ্লোয়েমের মাধ্যমে খাদ্য পরিবহন উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী উভয় দিকেই হতে পারে।
- অতিরিক্ত খাদ্য উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, ফল বা পাতায় সঞ্চিত থাকে (যেমন: গোল আলু, মিষ্টি আলু, আম)।
- ফ্লোয়েম পরিবহন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের অবস্থা (যেমন: তাপমাত্রা) দ্বারা প্রভাবিত হয়।

পার্থক্য:

নিচের ছকে ফ্লোয়েম কলার প্রধান দুটি কার্যকরী কোষ, সিভনল ও সঙ্গীকোষের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	সিভনল (Sieve Tube Element)	সঙ্গীকোষ (Companion Cell)
গঠন	লম্বা, নলাকার, একটির উপর একটি সজ্জিত।	সিভনলের পাশে অবস্থিত, অপেক্ষাকৃত ছোট ও সাধারণ কোষের মতো।
প্রাপ্ত প্রাচীর	ছিদ্রযুক্ত সিভ প্লেট গঠন করে।	ছিদ্রবিহীন সাধারণ কোষ প্রাচীর।

নিউক্লিয়াস	পরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াসবিহীন।	সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস উপস্থিত।
সাইটোপ্লাজম	পাতলা স্তর হিসেবে কোষপ্রাচীর ঘেঁষে থাকে, কোষগহ্বর বড়।	ঘন সাইটোপ্লাজম এবং অনেক রাইবোসোম ও মাইটোকন্ড্রিয়া যুক্ত।
প্রধান কাজ	দ্রবীভূত খাদ্য (সুকরোজ) পরিবহন করা।	সিভনলের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা, খাদ্য লোডিং ও আনলোডিং- এ সাহায্য করা।
উৎপত্তি	একই মাতৃকোষ থেকে সিভনল ও সংশ্লিষ্ট সঙ্গীকোষ উৎপন্ন হয়।	একই মাতৃকোষ থেকে সিভনল ও সংশ্লিষ্ট সঙ্গীকোষ উৎপন্ন হয়।
নির্ভরশীলতা	কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সঙ্গীকোষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।	সিভনলের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণে অত্যাবশ্যিকীয় ভূমিকা পালন করে।

প্রস্বেদন

প্রস্বেদন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (Physiological process) যার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার বায়বীয় অঙ্গ (যেমন - পাতা, কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি) থেকে মূল দ্বারা শোষিত অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে দেহের বাইরে বের করে দেয়। সহজভাবে বললে, উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে বা অন্যান্য বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো প্রস্বেদন।

বিস্তারিত বর্ণনা:

উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি শোষণ করে। কিন্তু শোষিত পানির অতি সামান্য অংশই উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবনিক বা শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকি প্রায় সমস্ত অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদ দেহ থেকে বাষ্পাকারে বের করে দেয়। এই অত্যাবশ্যিকীয় প্রক্রিয়াটিই হলো প্রস্বেদন।

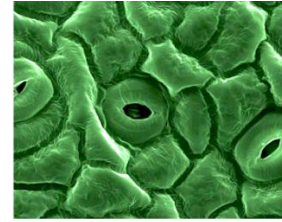
প্রস্বেদনের স্থান:

প্রস্বেদন মূলত উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গে ঘটে, তবে প্রধান অঙ্গ হলো পাতা। এছাড়া কচি কাণ্ড, ফুলের বৃতি ও পাপড়ি দিয়েও অল্প পরিমাণে প্রস্বেদন হতে পারে।

প্রস্বেদনের প্রকারভেদ:

উদ্ভিদের যে অঙ্গ বা ছিদ্রপথের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয়, তার ভিত্তিতে প্রস্বেদন প্রধানত তিন প্রকারের হয়:

(ক) পত্ররঞ্জীয় প্রস্বেদন (Stomatal Transpiration):



চিত্র: একটি খোলা ও বন্ধ পত্ররঞ্জ

- উদ্ভিদের পাতা, কচি কাণ্ড এবং ফুলের বৃতি ও পাপড়ির ত্বক বা এপিডার্মিসে অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ (Guard cell) দ্বারা পরিবেষ্টিত এক ধরনের সূক্ষ্ম রন্ধ্র বা ছিদ্র থাকে, যাকে পত্ররন্ধ্র (Stoma, বহুবচনে Stomata) বলে। (চিত্র ৬.০৩ দ্রষ্টব্য)।
- এই পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে যখন জলীয় বাষ্প উদ্ভিদের দেহ থেকে বাইরে নির্গত হয়, তখন তাকে পত্ররঞ্জীয় প্রস্বেদন বলে।
- উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের সিংহভাগ (প্রায় ৯০-৯৫%) এই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। রক্ষীকোষ এই রন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে প্রস্বেদনের হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

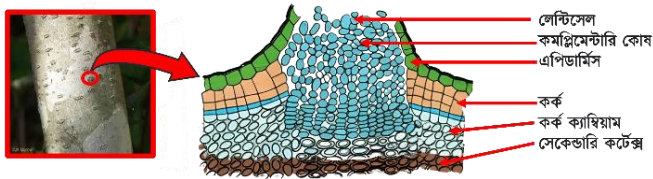
(খ) কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular Transpiration):

- উদ্ভিদের পাতা ও কচি কাণ্ডের বহিঃত্বকের (এপিডার্মিস) উপর কিউটিন (Cutin) নামক স্নেহজাতীয় পদার্থ জমা

হয়ে যে পাতলা আবরণ তৈরি করে, তাকে কিউটিকল (Cuticle) বলে।

- এই কিউটিকল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।
- যেহেতু কিউটিকল পানির জন্য প্রায় অপ্রবেশ্য, তাই এই প্রক্রিয়ায় খুব কম পরিমাণে পানি দেহ থেকে নির্গত হয়।

(গ) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular Transpiration):



চিত্র: একটি লেন্টিসেল

- উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখা যখন বয়স্ক হয় এবং গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) ঘটে, তখন তার বাকল ফেটে কিছু ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এই ছিদ্রগুলোকে লেন্টিসেল (Lenticel) বলে। লেন্টিসেলের ভিতরের কোষগুলো সাধারণত আলগাভাবে সজ্জিত থাকে।
- লেন্টিসেলের মাধ্যমে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াকে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।
- এই উপায়ে নির্গত পানির পরিমাণ খুবই নগণ্য।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- প্রস্বেদন হলো উদ্ভিদ দেহের বায়বীয় অঙ্গ থেকে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে নির্গমনের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া।
- প্রস্বেদন প্রধানত পাতার মাধ্যমে ঘটে।
- অঙ্গ বা ছিদ্রপথের ভিত্তিতে প্রস্বেদন তিন প্রকার: পত্ররঞ্জীয়, কিউটিকুলার ও লেন্টিকুলার।
- পত্ররঞ্জীয় প্রস্বেদন পাতার পত্ররন্ধ্র (Stomata) দিয়ে ঘটে এবং এটিই প্রধানতম (৯০-৯৫%) প্রস্বেদন। (উদাহরণ: আম গাছের পাতা থেকে বাষ্পাকারে পানি বের হওয়া)।
- কিউটিকুলার প্রস্বেদন পাতার বা কাণ্ডের উপরস্থ কিউটিকল (Cuticle) ভেদ করে ঘটে, এতে পানির অপচয় খুব কম হয়।

- লেন্টিকুলার প্রস্বেদন কাণ্ডের বাকলে অবস্থিত লেন্টিসেল (Lenticel) নামক ছিদ্র দিয়ে ঘটে, এতে পানির অপচয় নগণ্য। (উদাহরণ: বয়স্ক আম গাছের কাণ্ড থেকে)।
- প্রস্বেদন উদ্ভিদের পানি শোষণ, রসের উর্ধ্বমুখী পরিবহন এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পার্থক্য:

নিচের ছকে বিভিন্ন প্রকার প্রস্বেদনের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	পত্ররঞ্জীয় প্রস্বেদন	কিউটিকুলার প্রস্বেদন	লেন্টিকুলার প্রস্বেদন
ব্যবহৃত অঙ্গ/ছিদ্র	পত্ররন্ধ্র (Stomata)	কিউটিকল (Cuticle)	লেন্টিসেল (Lenticel)
অবস্থান	মূলত পাতা, কচি কাণ্ড, ফুলের অংশবিশেষের বহিঃস্থকে।	পাতা ও কচি কাণ্ডের বহিঃস্থকের উপর।	বয়স্ক মূল ও কাণ্ডের বাকলে (ছকে)।
নিয়ন্ত্রণ	রক্ষীকোষ (Guard cell) দ্বারা পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।	সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কিউটিকলের পুরুত্বের উপর নির্ভরশীল।	সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, লেন্টিসেলের গঠন দ্বারা সীমিত।
মোট প্রস্বেদনের হার	সর্বাধিক (প্রায় ৯০-৯৫%)।	খুব কম।	নগণ্য (প্রায় ১% বা তারও কম)।
পরিবেশের প্রভাব	আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়।	কম প্রভাবিত হয়।	কম প্রভাবিত হয়।

প্রস্বেদনের প্রভাবক

প্রস্বেদন হলো উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গ থেকে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার হার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক (বাহ্যিক) এবং উদ্ভিদের নিজস্ব (অভ্যন্তরীণ) কারণ বা শর্তের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। যে সমস্ত কারণ বা শর্ত প্রস্বেদনের হারকে প্রভাবিত (বৃদ্ধি বা হ্রাস) করে, সেগুলোকে প্রস্বেদনের প্রভাবক বলা হয়।

বিস্তারিত বর্ণনা:

প্রস্বেদনের হার সর্বদা একরকম থাকে না। পরিবেশের অবস্থা এবং উদ্ভিদের গঠনের উপর নির্ভর করে এর হার পরিবর্তিত হয়। এই প্রভাবকগুলোকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) বাহ্যিক প্রভাবক (External Factors): এগুলো হলো পরিবেশগত উপাদান যা উদ্ভিদের চারপাশের অবস্থা নির্ধারণ করে।

১. তাপমাত্রা (Temperature): তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পানি দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পত্ররন্ধ্রও বেশি উন্মুক্ত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। তাপমাত্রা কমে গেলে প্রস্বেদনের হার কমে যায়।

২. আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity): বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এবং ওই তাপমাত্রায় বায়ুর সর্বোচ্চ জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতার আনুপাতিক হারকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে (অর্থাৎ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হলে) পাতার ভেতর এবং বাইরের বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পের ঘনত্বের পার্থক্য কমে যায়, ফলে ব্যাপন হার কমে যায় এবং এতে প্রস্বেদনের হারও হ্রাস পায়। অপরপক্ষে, বায়ু শুষ্ক হলে (অর্থাৎ আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে) পাতার ভেতর থেকে জলীয় বাষ্প দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে এবং প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় প্রস্বেদন কম হয়, কিন্তু শীতকালে বা শুষ্ক আবহাওয়ায় বাতাস শুকনো থাকায় প্রস্বেদন বেশি হয়।

৩. আলো (Light): আলোর উপস্থিতিতেই পত্ররন্ধ্র খোলে, তাই দিনের বেলায় আলো থাকলে প্রস্বেদন চলে। আলোর

তীব্রতা বাড়লে প্রস্বেদনের হারও সাধারণত বাড়ে (কারণ পত্ররন্ধ্র বেশি খোলে)। অন্ধকারে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় বলে প্রস্বেদনও প্রায় বন্ধ থাকে। আলো পরোক্ষভাবে পাতায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করেও প্রস্বেদনের হার বাড়াতে সাহায্য করে।

৪. বায়ুপ্রবাহ (Wind): প্রস্বেদনের ফলে পাতার চারপাশে জলীয় বাষ্প জমা হয়ে একটি আর্দ্র স্তর তৈরি হয়, যা প্রস্বেদনের হার কমিয়ে দেয়। বায়ুপ্রবাহ এই আর্দ্র বায়ুস্তরকে সরিয়ে দেয়, ফলে ব্যাপন প্রক্রিয়া সচল থাকে এবং প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায়। তবে খুব বেশি বেগে বাতাস বইলে অনেক সময় পত্ররন্ধ্র আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তখন প্রস্বেদনের হার কিছুটা কমে যায়। মেঘলা দিনে বা বাতাসহীন দিনে প্রস্বেদন কম হয়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবক (Internal Factors): এগুলো উদ্ভিদের নিজস্ব গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য।

১. পত্ররন্ধ্র (Stomata): পাতার মোট সংখ্যা, প্রতি পাতায় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও আয়তন, গঠন এবং বিন্যাস (যেমন, পাতার উপরের বা নিচের ত্বকে অবস্থান) প্রস্বেদনের হারকে প্রভাবিত করে। পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কার্যকারিতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। বেশিসংখ্যক পত্ররন্ধ্র খোলা থাকলে প্রস্বেদনের হার বাড়ে।

২. পাতার সংখ্যা ও আয়তন: স্বাভাবিকভাবেই, উদ্ভিদের মোট পাতার সংখ্যা ও ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে, প্রস্বেদনের জন্য তত বেশি স্থান পাওয়া যাবে এবং মোট প্রস্বেদনের পরিমাণও তত বাড়বে।

৩. পাতার গঠন: পাতার বহিঃত্বকে কিউটিকলের পুরুত্ব বেশি হলে বা অতিরিক্ত মোমের আস্তরণ থাকলে কিউটিকুলার প্রস্বেদন কমে যায়। পাতায় রোম বা শুষ্ক আঁশ থাকলে, বা পত্ররন্ধ্রগুলো পাতার ভেতরের দিকে গর্তে অবস্থিত (Sunken stomata) হলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায় (যেমন মরুভূমির উদ্ভিদে দেখা যায়)।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- প্রস্বেদনের হার পরিবেশের (বাহ্যিক) এবং উদ্ভিদের নিজস্ব (অভ্যন্তরীণ) প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- বাহ্যিক প্রভাবক:

1. তাপমাত্রা বাড়লে প্রস্বেদন বাড়ে।
2. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমলে (বায়ু শুষ্ক হলে) প্রস্বেদন বাড়ে।
3. আলোর উপস্থিতিতে ও তীব্রতা বাড়লে প্রস্বেদন বাড়ে।
4. বায়ুপ্রবাহ বাড়লে (নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত) প্রস্বেদন বাড়ে।

• **অভ্যন্তরীণ প্রভাবক:**

1. পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা, আকার ও খোলা-বন্ধ হওয়ার উপর প্রস্বেদন নির্ভরশীল।
2. পাতার মোট ক্ষেত্রফল বেশি হলে প্রস্বেদন বাড়ে।
3. পাতার বিশেষ গঠন (যেমন: পুরু কিউটিকল, রোম, নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র) প্রস্বেদন কমাতে পারে।

পার্থক্য (বাহ্যিক প্রভাবকের প্রভাব):

নিচের ছকে প্রধান বাহ্যিক প্রভাবকগুলো প্রস্বেদনের হারকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা সংক্ষেপে দেখানো হলো:

বাহ্যিক প্রভাবক	প্রভাবকের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে প্রস্বেদনের হার	কারণ (সংক্ষেপে)
তাপমাত্রা	বাড়ে	বাষ্পীভবন বাড়ে, পত্ররন্ধ্র খোলে।
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	কমে	পাতার ভেতর ও বাইরের জলীয় বাষ্পের ঘনত্বের পার্থক্য কমে যায়।
আলো	বাড়ে	পত্ররন্ধ্র খোলে, তাপমাত্রা বাড়ে।
বায়ুপ্রবাহ	বাড়ে (নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত)	পাতার চারপাশের আর্দ্র বায়ুস্তর সরে যায়, ব্যাপন হার সচল থাকে।

প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল

প্রস্বেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ (যেমন: পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন) করলেও এর ফলে উদ্ভিদ দেহ থেকে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়, যা

কখনো কখনো উদ্ভিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই দ্বিমুখী ভূমিকার জন্যই বিজ্ঞানী কার্টিস (Curtis) সহ অনেক বিজ্ঞানী প্রস্বেদনকে 'অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল' বা 'Necessary Evil' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, এটি উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য হলেও এর ক্ষতিকর দিকও রয়েছে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

প্রস্বেদন প্রক্রিয়াটিকে কেন একই সাথে 'অতি প্রয়োজনীয়' আবার 'অমঙ্গল' বলা হয়, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

প্রস্বেদনের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারী দিক (Why it is Necessary):

১. পানি ও খনিজ লবণ শোষণ ও পরিবহন: উদ্ভিদ মূল দিয়ে যে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে, তা কাণ্ড বেয়ে পাতায় পৌঁছানোর জন্য একটি উর্ধ্বমুখী টানের প্রয়োজন হয়। প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পাতা থেকে পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে জাইলেম বাহিকার পানির স্তম্ভে একটি শক্তিশালী টান (প্রস্বেদন টান বা Transpiration pull) সৃষ্টি হয়। এই টানই কোষরস বা স্যাপকে (পানি ও খনিজ লবণের মিশ্রণ) মূল থেকে টেনে পাতায় পৌঁছে দেয়। এই প্রক্রিয়া ছাড়া উদ্ভিদের পক্ষে পর্যাপ্ত পানি ও খনিজ লবণ দেহের সর্বত্র পরিবহন করা সম্ভব নয়, যা তার সালোকসংশ্লেষণ ও অন্যান্য বিপাকীয় কাজ ব্যাহত করবে।

২. পানি শোষণ অব্যাহত রাখা: প্রস্বেদনের ফলে পাতা থেকে ক্রমাগত পানি বেরিয়ে যাওয়ায় মূল থেকে পাতা পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন চোষক শক্তির বা ব্যাপন চাপ ঘাটতির (DPD) নতিমাত্রা বজায় থাকে। এটি মূলকে মাটি থেকে অবিরাম পানি শোষণে উৎসাহিত করে।

৩. দেহকে শীতল রাখা: বাষ্পীভবনের সময় সুপ্ততাপ ব্যবহৃত হয় বলে প্রস্বেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদ অঙ্গের (বিশেষ করে পাতার) তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। প্রখর সূর্যালোকে বা গ্রীষ্মকালে পাতার তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রস্বেদন পাতাকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং কোষগুলোকে তাপমাত্রা

সহনশীল পর্যায়ে রাখে, যা উদ্ভিদকে সজীব ও সতেজ রাখতে সহায়তা করে।

৪. পাতায় পানির ঘনত্ব বজায় রাখা: প্রস্বেদনের ফলে কোষ থেকে পানি বেরিয়ে যাওয়ায় কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, যা কোষের পানি শোষণ ক্ষমতা (অভিশ্রবণ) বজায় রাখতে সাহায্য করে।

প্রস্বেদনের অমঙ্গল বা অপকারী দিক (Why it is an Evil):

১. পানির ঘাটতি সৃষ্টি: প্রস্বেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার শোষিত পানির প্রায় ৯৯% ভাগই হারিয়ে ফেলে। যদি মাটি থেকে পানি শোষণের হার অপেক্ষা প্রস্বেদনের হার বেশি হয়, বিশেষ করে শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ায় বা মাটিতে পানির অভাব থাকলে, তবে উদ্ভিদের দেহে পানির চরম ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে (Wilting), সালোকসংশ্লেষণ ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং তীব্র পানি ঘাটতির কারণে উদ্ভিদ মারাও যেতে পারে।

২. শক্তি ক্ষয়: প্রস্বেদন প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের শক্তি ক্ষয় করে, কারণ যে বিপুল পরিমাণ পানি শোষণ ও পরিবহনের জন্য উদ্ভিদকে শক্তি ব্যয় করতে হয়, তার প্রায় পুরোটাই আবার প্রস্বেদনের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়।

৩. শোষণ ব্যাহত হওয়া (প্রস্বেদন বন্ধ হলে): যদি কোনো কারণে (যেমন - অতিরিক্ত আর্দ্রতা, তীব্র খরা বা রোগ) প্রস্বেদন বন্ধ হয়ে যায়, তবে প্রস্বেদন টান সৃষ্টি হয় না। এর ফলে মূল কর্তৃক পানি ও খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াও অনেকাংশে কমে বা বন্ধ হয়ে যায়, যা উদ্ভিদের পুষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়।

উপসংহার:

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের যেমন উপকার হয়, তেমনি অপকারও হতে পারে। তবে পানি অপচয় বা ঘাটতির ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন, দেহ শীতল রাখা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজের জন্য প্রস্বেদন অপরিহার্য। উদ্ভিদ এই প্রয়োজনীয় কাজটি বাদ দিতে পারে না। তাই এর ক্ষতিকর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও

প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক, যা একে 'অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল'-এ পরিণত করেছে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

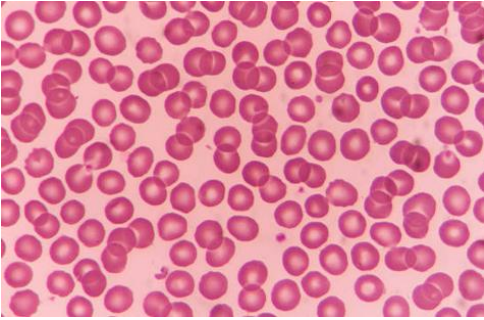
- প্রস্বেদনকে 'অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল' বলা হয় কারণ এর উপকারী ও অপকারী উভয় দিকই রয়েছে।
- **উপকারী দিক (প্রয়োজনীয়):**
 1. প্রস্বেদন টান সৃষ্টি করে, যা পানি ও খনিজ লবণ পরিবহনে (কোষরসের আরোহণে) মুখ্য ভূমিকা রাখে।
 2. বাষ্পীভবনের মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহকে, বিশেষ করে পাতাকে শীতল রাখে।
 3. মূল কর্তৃক পানি শোষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে সাহায্য করে।
- **অপকারী দিক (অমঙ্গল):**
 1. দেহ থেকে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয়, যা পানির ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে।
 2. অতিরিক্ত প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে এবং চরম অবস্থায় মারাও যেতে পারে।
 3. প্রস্বেদন বন্ধ হয়ে গেলে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ ব্যাহত হয়।
 4. অপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও অত্যাবশ্যকীয় কাজের জন্য উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন অপরিহার্য।

পার্থক্য (প্রয়োজনীয় ও অমঙ্গল দিক):

দিক	প্রয়োজনীয় (উপকার)	অমঙ্গল (অপকার)
পানি পরিবহন	প্রস্বেদন টান পানি ও খনিজ লবণ উপরে পরিবহনের মূল চালিকা শক্তি।	অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে হারিয়ে যায়, যা পানির ঘাটতি তৈরি করতে পারে।
তাপমাত্রা	বাষ্পীভবনের মাধ্যমে উদ্ভিদ অঙ্গ শীতল রাখে।	-

পানি শোষণ	অবিরাম শোষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে সাহায্য করে।	পানির ঘাটতি হলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে বা মারাও যেতে পারে।
শক্তি	-	বিপুল পরিমাণ পানি শোষণ ও পরিবহনে যে শক্তি ব্যয় হয়, তার অপচয় ঘটে।
পুষ্টি	খনিজ লবণ পরিবহনে সহায়তা করে।	প্রস্বেদন বন্ধ হলে খনিজ লবণ শোষণও ব্যাহত হয়।

মানবদেহে রক্ত সংবহন



চিত্র: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা রক্তের উপাদান। লোহিত রক্তকোষ, শ্বেত রক্তকোষ ও অণুচক্রিকা যথাক্রমে লাল, নীল ও কালো রঙের তাঁর নিয়ে নির্দেশিত

মানবদেহে রক্ত সংবহন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের ফলে রক্তনালির মধ্য দিয়ে অবিরাম দেহের সকল সজীব কোষে প্রবাহিত হয় এবং প্রতিটি কোষে অক্সিজেন (O_2) ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে ও সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) সহ অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট অঙ্গে বহন করে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন হয়, তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System) বলে। এটি দেহের প্রতিটি কোষকে সজীব ও সক্রিয় রাখে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

রক্তকে বলা হয় জীবনের ভিত্তি বা জীবনীশক্তির মূল। এই রক্ত দেহের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করে রক্ত সংবহনতন্ত্র।

মানব সংবহনতন্ত্রের প্রকৃতি:

মানুষের সংবহনতন্ত্র হলো বদ্ধ সংবহনতন্ত্র (Close circulatory system)। এর অর্থ হলো, রক্ত সবসময় হৃৎপিণ্ড এবং নির্দিষ্ট নালিপথের (ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি) মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, কখনোই রক্তনালি থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি দেহগহ্বরে উন্মুক্ত হয় না। এর ফলে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়:

- রক্ত সরাসরি বিভিন্ন অঙ্গের কোষে না গিয়ে নালিকার মাধ্যমে পৌঁছে, ফলে কোষে কোষে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ সহজ হয়।
- রক্তনালির ব্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে দেহের কোনো বিশেষ অঙ্গে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ পরিভ্রমণ করে দ্রুত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, ফলে সম্পূর্ণ দেহে রক্ত সংবহন হতে খুব কম সময় লাগে (প্রায় এক মিনিট বা তারও কম)।

মানব পরিবহনতন্ত্র:

মানবদেহের সামগ্রিক পরিবহনতন্ত্র মূলত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

১. রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System): এর প্রধান উপাদানগুলো হলো - হৃৎপিণ্ড (Heart), রক্তনালি (Blood vessels: ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি) এবং রক্ত (Blood)।

২. লসিকা সংবহনতন্ত্র (Lymphatic System): এর প্রধান উপাদানগুলো হলো - লসিকা (Lymph), লসিকা নালি (Lymphatic vessels) এবং লসিকাগ্রন্থি বা লিম্ফনোড (Lymph node)।

এই দুটি তন্ত্র সম্মিলিতভাবে দেহের পরিবহন কার্য সম্পাদন করে। তবে মূল সংবহনের কাজটি রক্ত সংবহনতন্ত্রই করে থাকে।

রক্ত সংবহনের গুরুত্ব:

- কোষে কোষে অক্সিজেন ও পরিপোষক পদার্থ (যেমন: গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, খনিজ লবণ) সরবরাহ করা।

- কোষ থেকে বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ (যেমন: কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া) সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট রেচন অঙ্গে (যেমন: ফুসফুস, বৃক্ক) বহন করা।
- হরমোন দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা।
- দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করা (রক্তের শ্বেতকণিকা ও অ্যান্টিবডি দ্বারা)।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- মানবদেহে রক্ত সংবহন হলো হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির মাধ্যমে রক্তের অবিরাম প্রবাহ।
- এর মাধ্যমে কোষে অক্সিজেন, পুষ্টি সরবরাহ এবং কোষ থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারিত হয়।
- মানুষের সংবহনতন্ত্র 'বদ্ধ' প্রকৃতির, অর্থাৎ রক্ত সর্বদা হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির মধ্যে আবদ্ধ থাকে।
- বদ্ধ সংবহনের সুবিধা হলো - দ্রুত পরিবহন, সুনির্দিষ্ট সরবরাহ এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ।
- মানব পরিবহনতন্ত্র রক্ত সংবহনতন্ত্র ও লসিকা সংবহনতন্ত্র নিয়ে গঠিত।
- রক্ত সংবহনতন্ত্রের মূল উপাদান: হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি (ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি) ও রক্ত।

পার্থক্য (বদ্ধ ও মুক্ত সংবহনতন্ত্র):

যদিও মানুষের সংবহনতন্ত্র বদ্ধ প্রকৃতির, অন্যান্য কিছু প্রাণীতে (যেমন: পোকামাকড়, শামুক) মুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়। নিচে এই দুই ধরনের সংবহনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	বদ্ধ সংবহনতন্ত্র (Closed Circulation)	মুক্ত সংবহনতন্ত্র (Open Circulation)
রক্তের অবস্থান	রক্ত সর্বদা হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির (ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি) মধ্যে আবদ্ধ থাকে।	রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে নালিপথে বের হয়ে দেহগহ্বরে (হিমোসিল) উন্মুক্ত হয় এবং সরাসরি

		কোষকে সিক্ত করে।
কৈশিকনালির উপস্থিতি	ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে কৈশিকনালির জালক উপস্থিত।	কৈশিকনালি অনুপস্থিত।
রক্তপ্রবাহের গতি	তুলনামূলকভাবে দ্রুত।	তুলনামূলকভাবে ধীর।
রক্তচাপ	তুলনামূলকভাবে বেশি।	তুলনামূলকভাবে কম।
পরিবহন দক্ষতা	বেশি দক্ষ; নির্দিষ্ট অঙ্গে রক্ত সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।	কম দক্ষ; নির্দিষ্ট অঙ্গে রক্ত সরবরাহ সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
রক্ত ও কলারস	রক্ত ও আন্তঃকোষীয় রস (কলারস/লসিকা) পৃথক থাকে।	রক্ত ও কলারস মিশ্রিত হয়ে যায়, যাকে হিমোলিম্ফ বলে।
উদাহরণ	সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী (যেমন: মানুষ, মাছ, পাখি), কেঁচো, অক্টোপাস।	পতঙ্গ (যেমন: তেলাপোকা, ঘাসফড়িং), মাকড়সা, চিংড়ি, শামুক, বিনুক ইত্যাদি।

রক্ত ও রক্তরস



চিত্র: রক্তরস ও কণিকার পরিমাণ

রক্ত (Blood): রক্ত এক প্রকার তরল যোজক কলা (Fluid Connective Tissue)। এটি ঈষৎ ক্ষারীয় (pH ৭.৩৫-৭.৪৫), লবণাক্ত এবং লাল বর্ণের একটি তরল পদার্থ যা হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্যে আবৃত থেকে দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) নামক রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে রক্তের রং লাল দেখায়। (চিত্র ৬.০৬ দ্রষ্টব্য)। রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সংযোগ সাধন করে এবং পুষ্টি, অক্সিজেন, হরমোন পরিবহন ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

রক্তরস (Plasma): রক্তরস হলো রক্তের বর্ণহীন বা ঈষৎ হলুদাভ তরল অংশ বা মাত্রিকা (Matrix)। এটি রক্তের দুটি প্রধান উপাদানের একটি (অন্যটি হলো রক্তকণিকা)। রক্তের মোট আয়তনের প্রায় ৫৫ ভাগই হলো রক্তরস।

বিস্তারিত বর্ণনা:

রক্তের উপাদান (Components of Blood):

রক্ত প্রধানত দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত:

১. **রক্তরস (Plasma):** রক্তের তরল অংশ।

২. **রক্তকণিকা (Blood Corpuscles):** রক্তের কোষীয় উপাদান যা রক্তরসের মধ্যে ভাসমান থাকে। (এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে)।

(ক) রক্তরস (Plasma):

রক্তের বর্ণহীন বা হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশকে রক্তরস বলে। এটি রক্তের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ। রক্তরসের প্রধান উপাদান হলো পানি, যা মোট রক্তরসের প্রায় ৯০ ভাগ। বাকি ১০ ভাগ অংশে বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত বা ভাসমান অবস্থায় থাকে।

রক্তরসের উপাদানসমূহ:

১. **পানি (Water):** প্রায় ৯০%। এটি দ্রাবক হিসেবে কাজ করে এবং সকল উপাদানকে ধারণ করে।

২. **জৈব পদার্থ:**

প্রোটিন (Plasma Proteins): প্রায় ৭%। প্রধান প্রোটিনগুলো হলো:

অ্যালবুমিন (Albumin): রক্তের অসমোটিক চাপ রক্ষা করে।

গ্লোবিউলিন (Globulin): অ্যান্টিবডি (রোগ প্রতিরোধকারী) তৈরি করে ও অন্যান্য পদার্থ পরিবহনে সাহায্য করে।

ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen) ও প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin): রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

অন্যান্য জৈব পদার্থ:

গ্লুকোজ (Glucose): শর্করা, শক্তির উৎস।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিগণা (Lipids): যেমন - কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড।

অ্যামাইনো এসিড (Amino acid): প্রোটিনের গাঠনিক একক।

ভিটামিন (Vitamins): বিভিন্ন প্রকার।

হরমোন (Hormones): অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক বার্তাবাহক।

অ্যান্টিবডি (Antibodies): রোগ প্রতিরোধকারী প্রোটিন (গ্লোবিউলিনের অংশ)।

বর্জ্য পদার্থ (Waste Products): যেমন - কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), ইউরিয়া (Urea), ইউরিক অ্যাসিড (Uric acid), ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি যা বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রেচনের জন্য বাহিত হয়।

৩. **অজৈব লবণ (Inorganic Salts):** প্রায় ০.৯%। বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণের আয়ন, যেমন - সোডিয়াম (Na^+), পটাশিয়াম (K^+), ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}), ক্লোরাইড (Cl^-), বাইকার্বোনেট (HCO_3^-), ফসফেট (PO_4^{3-}) ইত্যাদি। এর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড (খাবার লবণ) ও সোডিয়াম বাইকার্বোনেট প্রধান। এরা রক্তের অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষা করে এবং অসমোটিক চাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

রক্তরসের কাজ:

- রক্তকণিকাসহ রক্তে দ্রবীভূত সকল পদার্থ দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করা।
- খাদ্য পরিপাকের পর শোষিত খাদ্য উপাদান (যেমন: গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাট) বিভিন্ন টিস্যুতে বহন করা।
- টিস্যু থেকে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ (যেমন: CO_2 , ইউরিয়া) রেচন অঙ্গে (ফুসফুস, বৃক্ক) বহন করা।

- হরমোন, এনজাইম, লিপিড, ভিটামিন ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করা।
- রক্তের অসমোটিক চাপ এবং অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- ফাইব্রিনোজেন ও অন্যান্য ক্লটিং ফ্যাক্টর ধারণ করে রক্ত তঞ্চনে (জমাট বাঁধা) সাহায্য করা।
- দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখা।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- রক্ত হলো লাল বর্ণের তরল যোজক কলা যা হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির মাধ্যমে সারা দেহে সঞ্চালিত হয়।
- রক্তের লাল রং হিমোগ্লোবিনের কারণে হয়।
- রক্তের প্রধান দুটি উপাদান হলো রক্তরস (প্রায় ৫৫%) এবং রক্তকণিকা (প্রায় ৪৫%)।
- রক্তরস হলো রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ, যার প্রধান উপাদান পানি (প্রায় ৯০%)।
- রক্তরসে দ্রবীভূত থাকে প্রোটিন (অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন), গ্লুকোজ, চর্বি, খনিজ লবণ, ভিটামিন, হরমোন, অ্যান্টিবডি ও বর্জ্য পদার্থ (CO_2 , ইউরিয়া)।
- রক্তরস রক্তকণিকা ও দ্রবীভূত পদার্থ পরিবহনে, রক্ত জমাট বাঁধতে এবং অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষায় সাহায্য করে।

পার্থক্য (রক্তের প্রধান দুই উপাদান):

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	রক্তরস (Plasma)	রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)
ভৌত অবস্থা	তরল (রক্তের জলীয় বা মাতৃকা অংশ)।	কোষীয় বা কঠিন উপাদান (রক্তরসে ভাসমান)।
বর্ণ	বর্ণহীন বা ঈষৎ হলুদাভ।	বিভিন্ন প্রকার (লোহিত কণিকা লাল, শ্বেতকণিকা বর্ণহীন, অণুচক্রিকা বর্ণহীন)।

আয়তন (% রক্ত)	প্রায় ৫৫%।	প্রায় ৪৫%।
প্রধান উপাদান	পানি (৯০%), প্রোটিন, গ্লুকোজ, লবণ, হরমোন, বর্জ্য ইত্যাদি।	লোহিত রক্তকণিকা (RBC), শ্বেত রক্তকণিকা (WBC), অণুচক্রিকা (Platelets)।
প্রধান কাজ	রক্তকণিকা ও দ্রবীভূত পদার্থ পরিবহন, রক্ত তঞ্চন, অভিস্রবণিক চাপ রক্ষা।	অক্সিজেন পরিবহন (RBC), রোগ প্রতিরোধ (WBC), রক্ত তঞ্চনে সহায়তা (Platelets)।

রক্তকণিকা ও লোহিত রক্তকণিকা

রক্তকণিকা (Blood Corpuscles): রক্তরসের মধ্যে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের কোষীয় উপাদানকে একত্রে রক্তকণিকা বলে। মানবদেহে প্রধানত তিন ধরনের রক্তকণিকা দেখা যায়: লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood cells বা RBCs), শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood cells বা WBCs) এবং অণুচক্রিকা (Platelets)।

লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Cells - RBCs): মানবদেহের রক্তকণিকাগুলোর মধ্যে যে কোষগুলো সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, দ্বি-অবতল চাকতির মতো দেখতে, নিউক্লিয়াসবিহীন এবং হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ ধারণ করার ফলে লাল বর্ণের দেখায়, তাদের লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte) বলে। এর প্রধান কাজ হলো অক্সিজেন পরিবহন করা।

বিস্তারিত বর্ণনা:

রক্তের প্রায় ৪৫% অংশ জুড়ে রয়েছে রক্তকণিকা। এই

কণিকাগুলো রক্তের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে।
মানবদেহের তিন ধরনের রক্তকণিকা:

১. লোহিত রক্তকণিকা (RBC)
২. শ্বেত রক্তকণিকা (WBC)
৩. অণুচক্রিকা (Platelets)

(i) লোহিত রক্তকণিকা (RBC):

- **সংখ্যা:** তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ পুরুষে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এর সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ (৫ মিলিয়ন)। স্ত্রীলোকের রক্তে এর সংখ্যা সামান্য কম থাকে। শিশুদের দেহে এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। শ্বেত রক্তকণিকার তুলনায় এরা প্রায় ৫০০ গুণ বেশি।
- **উৎপত্তি:** লোহিত রক্তকণিকা ভ্রূণ অবস্থায় কুসুম থলি, যকৃত ও প্লীহাতে উৎপন্ন হলেও জন্মের পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মূলত লাল অস্থিমজ্জা (Red bone marrow) থেকে উৎপন্ন হয় (যেমন: লম্বা হাড়ের প্রান্ত, কশেরুকা, স্টার্নাম, পশ্চিমজ্জা)।
- **আকৃতি ও গঠন:** পরিণত লোহিত রক্তকণিকা গোল, দ্বি-অবতল (biconcave), চাকতির মতো দেখতে (চিত্র ৬.০৮ দ্রষ্টব্য)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (যেমন মানুষ) পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিয়াস না থাকায় এরা বিভাজিত হতে পারে না এবং এতে হিমোগ্লোবিন ধারণের জন্য বেশি জায়গা পাওয়া যায়। দ্বি-অবতল আকৃতির কারণে এর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায়, যা গ্যাস বিনিময়ে সহায়ক হয়।
- **হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin):** লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন নামক একটি লৌহঘটিত (Iron-containing) প্রোটিন জাতীয় রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণেই রক্তের রং লাল হয়। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ হলো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন (O_2) গ্রহণ করে তা অক্সিহিমোগ্লোবিন (HbO_2) রূপে দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেওয়া এবং কোষ থেকে উৎপন্ন কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)

ফুসফুসে ফেরত নিয়ে আসা। রক্তে হিমোগ্লোবিন বা লোহিত কণিকার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তাল্পতা বা রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া (Anemia) বলে।

- **আয়ুষ্কাল ও পরিণতি:** লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু প্রায় ১২০ দিন। আয়ুষ্কাল শেষ হলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এগুলো প্রধানত প্লীহা (Spleen) এবং যকৃতে (Liver) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেহে প্রতিনিয়ত পুরনো লোহিত কণিকা ধ্বংস হয় এবং নতুন কণিকা অস্থিমজ্জা থেকে রক্তে আসে, ফলে এর সংখ্যা মোটামুটি স্থির থাকে।
- **কাজ:**
 - দেহের সকল কোষে অক্সিজেন (O_2) পরিবহন করা (প্রধান কাজ)।
 - কোষ থেকে ফুসফুসে অল্প পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবহন করা।
 - রক্তের ঘনত্ব (Viscosity) ও সান্দ্রতা রক্ষা করা।
 - রক্তের বাফার ক্রিয়া ও অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষায় সহায়তা করা।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- রক্তে তিন প্রকার কণিকা থাকে: লোহিত রক্তকণিকা (RBC), শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) ও অণুচক্রিকা (Platelets)।
- লোহিত রক্তকণিকা (RBC) সংখ্যায় সর্বাধিক (প্রায় ৫০ লক্ষ/ঘন মিমি), দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন (পরিণত অবস্থায়)।
- এতে লাল বর্ণের হিমোগ্লোবিন থাকে, যা অক্সিজেন (O_2) ও সামান্য কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবহন করে।
- হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন (HbO_2) গঠন করে।
- RBC লাল অস্থিমজ্জায় তৈরি হয় এবং এর গড় আয়ু প্রায় ১২০ দিন।
- RBC বা হিমোগ্লোবিনের অভাবজনিত রোগ হলো অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা।

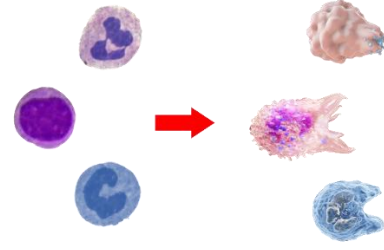
- এর প্রধান কাজ কোষে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করা।

পার্থক্য (তিন প্রকার রক্তকণিকার প্রাথমিক তুলনা):

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	লোহিত রক্তকণিকা (RBC)	শ্বেত রক্তকণিকা (WBC)	অণুচক্রিকা (Platelet)
নিউক্লিয়াস (পরিণত)	অনুপস্থিত (স্তন্যপায়ীতে)	উপস্থিত	অনুপস্থিত
হিমোগ্লোবিন	উপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত
আপেক্ষিক সংখ্যা	সর্বাধিক (প্রায় ৫০০ গুণ বেশি WBC অপেক্ষা)	RBC অপেক্ষা অনেক কম (RBC:WBC $\approx$ ৫০০:১)	RBC ও WBC অপেক্ষা কম (মাঝারি)
প্রধান কাজ	অক্সিজেন (O_2) পরিবহন	রোগ প্রতিরোধ (দেহের সৈনিক)	রক্ত তঞ্চনে (জমাট বাঁধা) সহায়তা
আকৃতি	দ্বি-অবতল চাকতির মতো	অনিয়ত বা গোলাকার (বিভিন্ন প্রকার)	অনিয়ত আকারের ক্ষুদ্র কণিকা

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট হলো মানব রক্তের এক প্রকার কোষীয় উপাদান, যাদের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই (অ্যামিবার মতো পরিবর্তনশীল), এরা হিমোগ্লোবিনবিহীন (তাই বর্ণহীন বা শ্বেত) এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত। লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে বড় হলেও সংখ্যায় এরা অনেক কম। এদের প্রধান কাজ হলো দেহকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, তাই এদের 'দেহের সৈনিক' (Soldiers of the body) বলা হয়।



বিস্তারিত বর্ণনা:

লোহিত রক্তকণিকার পাশাপাশি রক্তরসে ভাসমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কণিকা হলো শ্বেত রক্তকণিকা।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- আকার ও আকৃতি:** এদের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই, এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকার পরিবর্তন করতে পারে (অ্যামিবিয়ড)। এরা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে বড় হয়।
- নিউক্লিয়াস:** এদের সুস্পষ্ট ও তুলনামূলকভাবে বড় নিউক্লিয়াস থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিণত রক্তকণিকাগুলোর মধ্যে একমাত্র শ্বেত রক্তকণিকাতেই ডিএনএ (DNA) থাকে (কারণ এদের নিউক্লিয়াস আছে)।
- হিমোগ্লোবিন:** এতে হিমোগ্লোবিন না থাকায় এরা বর্ণহীন হয়।
- সংখ্যা:** লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় এদের সংখ্যা অনেক কম। সুস্থ মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার থেকে ১০ হাজার। তবে দেহে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে বা অসুস্থ অবস্থায় এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- আয়ুষ্কাল:** এদের গড় আয়ু তুলনামূলকভাবে কম, সাধারণত ১ থেকে ১৫ দিন। তবে প্রকারভেদ ও প্রয়োজন অনুসারে আয়ুষ্কাল পরিবর্তিত হতে পারে।
- চলাচল ও ডায়াপেডেসিস:** শ্বেত রক্তকণিকারা রক্তরসের মধ্যে অ্যামিবিয়ড পদ্ধতিতে নিজেরাই চলাচল করতে পারে। এছাড়াও এরা প্রয়োজনে রক্তনালির (বিশেষত কৈশিকনালির) প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরা দেহের যেকোনো প্রান্তে যেখানে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটেছে সেখানে পৌঁছে যেতে পারে।

- **কাজ ও ফ্যাগোসাইটোসিস:** শ্বেত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো দেহকে বহিরাগত জীবাণু (যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস), ক্ষতিকর বস্তু বা অ্যান্টিজেনের হাত থেকে রক্ষা করা। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণুগুলোকে ভক্ষণ করে ধ্বংস করে ফেলে। ফ্যাগোসাইটোসিস হলো এমন প্রক্রিয়া যেখানে শ্বেত রক্তকণিকা তার ক্ষণপদ বাড়িয়ে দিয়ে জীবাণুকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং পরে কোষের ভেতরে বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে সেটিকে পরিপাক করে ফেলে (চিত্র ৬.০৯ দ্রষ্টব্য)। এছাড়া কিছু শ্বেত রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি তৈরি করেও রোগ প্রতিরোধে অংশ নেয়।

প্রকারভেদ: গঠনগতভাবে সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্তকণিকাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়:

(ক) **অ্যাগ্রানুলোসাইট (Agranulocyte)** বা **দানাবিহীন:** এদের সাইটোপ্লাজমে কোনো দানা থাকে না বা থাকলেও তা খুব সূক্ষ্ম। উদাহরণ: লিম্ফোসাইট, মনোসাইট।

(খ) **গ্রানুলোসাইট (Granulocyte)** বা **দানায়ুক্ত:** এদের সাইটোপ্লাজমে সুস্পষ্ট দানা দেখা যায়। উদাহরণ: নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল (এগুলো নিয়েও উপরের শ্রেণিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়)।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) হলো নিউক্লিয়াসযুক্ত, হিমোগ্লোবিনবিহীন, বর্ণহীন রক্তকণিকা।
- এরা অ্যামিবার মতো আকার পরিবর্তন করতে পারে এবং সংখ্যায় RBC-এর চেয়ে অনেক কম (৪-১০ হাজার/ঘন মিমি)।
- অসুস্থ অবস্থায় বা জীবাণু সংক্রমণে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- এরা রক্তনালির প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুতে প্রবেশ করতে পারে।
- ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে দেহকে রক্ষা করাই এদের প্রধান কাজ। (উদাহরণ: ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণকারী শ্বেতকণিকা)।
- এদের 'দেহের সৈনিক' বলা হয়।

- গঠন অনুসারে এরা দুই প্রকার: অ্যাগ্রানুলোসাইট (দানাবিহীন) ও গ্রানুলোসাইট (দানায়ুক্ত)।
- এদের গড় আয়ু ১-১৫ দিন।

পার্থক্য (শ্বেত রক্তকণিকার প্রধান দুই প্রকার):

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	অ্যাগ্রানুলোসাইট (Agranulocyte)	গ্রানুলোসাইট (Granulocyte)
সাইটোপ্লাজমীয় দানা	অনুপস্থিত বা অস্পষ্ট।	সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত।
সাইটোপ্লাজমের প্রকৃতি	স্বচ্ছ বা দানাবিহীন দেখায়।	দানাময় বা অস্বচ্ছ দেখায়।
নিউক্লিয়াসের আকৃতি	সাধারণত বড়, গোলাকার বা বৃক্কাকার।	সাধারণত খণ্ডযুক্ত বা বিভিন্ন আকৃতির।
উদাহরণ (প্রকারভেদ)	লিম্ফোসাইট, মনোসাইট।	নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল।

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকারভেদ

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট প্রধানত দুই প্রকারের হয়, যা তাদের সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়: অ্যাগ্রানুলোসাইট (দানাবিহীন) এবং গ্রানুলোসাইট (দানায়ুক্ত)। এই প্রতিটি প্রকারের আবার উপপ্রকার রয়েছে, যারা দেহের প্রতিরক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

শ্বেত রক্তকণিকাগুলো দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং কাজ নিচে আলোচনা করা হলো (চিত্র ৬.১০ দ্রষ্টব্য):

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট (Agranulocyte):

এই ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ হয়। অ্যাগ্রানুলোসাইট প্রধানত দুই প্রকারের:

১. লিম্ফোসাইট (Lymphocyte):

গঠন: এরা সাধারণত ছোট আকারের শ্বেত কণিকা, তবে এদের নিউক্লিয়াস বেশ বড় ও গোলাকার হয়, যা কোষের বেশিরভাগ

স্থান দখল করে রাখে। সাইটোপ্লাজম পরিধি বরাবর পাতলা স্তরে বিন্যস্ত থাকে।

উৎপত্তি: দেহের লিম্ফয়েড অঙ্গ যেমন - লিম্ফনোড, টনসিল, প্লীহা, থাইমাস গ্রন্থি ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়।

কাজ: এরা দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিম্ফোসাইট নির্দিষ্ট জীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি (Antibody) নামক প্রোটিন তৈরি করে। এই অ্যান্টিবডি বহিরাগত জীবাণুকে ধ্বংস করে বা নিষ্ক্রিয় করে দেয়, ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২. মনোসাইট (Monocyte):

গঠন: এরা শ্বেত রক্তকণিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের। এদের নিউক্লিয়াসটিও বড় এবং সাধারণত বৃক্কাকার (কিডনির মতো) বা অশ্বক্ষুরাকার দেখতে হয়। সাইটোপ্লাজমের পরিমাণও বেশিক।

কাজ: মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত পারদর্শী। এরা সক্রিয়ভাবে জীবাণু, মৃত কোষ বা কোষের ভগ্নাংশ এবং অন্যান্য বহিরাগত বস্তুকে ভক্ষণ করে ধ্বংস করে ফেলে। রক্তস্রোত থেকে টিস্যুতে প্রবেশ করে এরা ম্যাক্রোফেজ (Macrophage) নামক বৃহৎ ভক্ষক কোষে রূপান্তরিত হতে পারে।

(খ) গ্রানুলোসাইট (Granulocyte):

এই ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট রঞ্জকে রঞ্জিত হতে পারে এমন দানা (Granules) থাকে। নিউক্লিয়াসের আকৃতির (এবং দানার রঞ্জন বৈশিষ্ট্যের) উপর ভিত্তি করে গ্রানুলোসাইট তিন প্রকার:

১. নিউট্রোফিল (Neutrophil):

গঠন: এদের নিউক্লিয়াস সাধারণত ৩-৫টি খণ্ড বা লোব (Lobe) বিশিষ্ট হয়। সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানায়ুক্ত।

কাজ: এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়াকে, ভক্ষণ করে। যেকোনো সংক্রমণের শুরুতে এরাই প্রথম ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং জীবাণু ধ্বংসের কাজ শুরু করে। তাই এদেরকে 'Microphage' বা ক্ষুদ্র ভক্ষক কোষও বলা হয়।

২. ইওসিনোফিল (Eosinophil):

গঠন: এদের নিউক্লিয়াস সাধারণত দুটি খণ্ডে বিভক্ত থাকে এবং সাইটোপ্লাজম বড় বড় লাল বা গোলাপী বর্ণের দানায় পূর্ণ থাকে (ইওসিন রঞ্জকে রঞ্জিত হয়)।

কাজ: এরা প্রধানত দেহের অ্যালার্জি (Allergy) জনিত প্রতিরোধে এবং কৃমি (Parasites) সংক্রমণে বাধা দেয়। এরা হিস্টামিন (Histamine) নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে, যা অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

৩. বেসোফিল (Basophil):

গঠন: এদের নিউক্লিয়াস দুই বা তিন খণ্ডযুক্ত হতে পারে, তবে সাইটোপ্লাজমের বড় বড় নীলাভ বা বেগুনি বর্ণের দানা (ক্ষারীয় রঞ্জকে রঞ্জিত হয়) দ্বারা তা প্রায়শই ঢাকা থাকে।

কাজ: এরাও অ্যালার্জি প্রতিরোধে অংশ নেয় এবং হিস্টামিন নিঃসরণ করে। এছাড়াও এরা হেপারিন (Heparin) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। হেপারিন রক্তনালির ভেতরে রক্ত জমাট বাঁধতে (Blood clotting) বাধা দেয়, অর্থাৎ এটি একটি অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট (Anticoagulant) বা রক্ততঞ্চন ক।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- শ্বেত রক্তকণিকা দুই প্রকার: অ্যাগ্রানুলোসাইট (দানাবিহীন) ও গ্রানুলোসাইট (দানায়ুক্ত)।
- অ্যাগ্রানুলোসাইট:
 1. **লিম্ফোসাইট:** বড় গোলাকার নিউক্লিয়াস; অ্যান্টিবডি তৈরি করে নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধ করে। (উদাহরণ: ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ)।
 2. **মনোসাইট:** সবচেয়ে বড় কণিকা, বৃক্কাকার নিউক্লিয়াস; ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে। (উদাহরণ: টিস্যুতে মৃত কোষ পরিষ্কার করা)।



চিত্র: বিভিন্ন প্রকার শ্বেতরক্তকণিকা

• গ্রানুলোসাইট:

1. **নিউট্রোফিল:** খণ্ডযুক্ত নিউক্লিয়াস; ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু (বিশেষত ব্যাকটেরিয়া) ভক্ষণ করে। (উদাহরণ: ক্ষতস্থানে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা)।
2. **ইওসিনোফিল:** দ্বি-খণ্ডযুক্ত নিউক্লিয়াস; হিস্টামিন নিঃসরণ করে অ্যালার্জি ও কৃমি সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। (উদাহরণ: হাঁপানি বা অ্যালার্জিতে এদের সংখ্যা বাড়ে)।
3. **বেসোফিল:** খণ্ডযুক্ত নিউক্লিয়াস (দানা দ্বারা আবৃত); হিস্টামিন (অ্যালার্জি) ও হেপারিন (রক্তনালিতে রক্ত জমাট রোধ) নিঃসরণ করে।

পার্থক্য (বিভিন্ন প্রকার শ্বেত রক্তকণিকার প্রধান কাজ):

শ্বেত রক্তকণিকার প্রকার	প্রধান কাজ(সমূহ)
লিম্ফোসাইট	অ্যান্টিবডি তৈরি করে নির্দিষ্ট জীবাণু ধ্বংস/নিষ্ক্রিয় করা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
মনোসাইট	ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ও মৃত কোষ ভক্ষণ করা (ম্যাক্রোফেজে রূপান্তরিত হয়)।
নিউট্রোফিল	ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু (বিশেষত ব্যাকটেরিয়া) ভক্ষণ করে।
ইওসিনোফিল	হিস্টামিন নিঃসরণ (অ্যালার্জি), কৃমি সংক্রমণ প্রতিরোধ।
বেসোফিল	হিস্টামিন নিঃসরণ (অ্যালার্জি), হেপারিন নিঃসরণ (রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধা রোধ)।

অণুচক্রিকা ও রক্ত তঞ্চন

- **অণুচক্রিকা (Platelet):** অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট হলো রক্তের এক প্রকার ক্ষুদ্রতম কোষীয় উপাদান, যারা নির্দিষ্ট আকৃতিবিহীন (গোলাকার, ডিম্বাকার বা রড আকৃতির হতে পারে), নিউক্লিয়াসবিহীন এবং অস্থিমজ্জার বৃহৎ কোষ (মেগাক্যারিওসাইট) থেকে উৎপন্ন হয়। এরা সম্পূর্ণ কোষ

নয়, বরং কোষের ছিন্ন বা খণ্ডিত অংশ।

- **রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting):** যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে সেখানকার রক্ত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়, তাকে রক্ত তঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধা প্রক্রিয়া বলে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

রক্তকণিকাগুলোর মধ্যে অণুচক্রিকা সংখ্যায় ও আকারে লোহিত ও শ্বেত কণিকার চেয়ে ভিন্ন।

অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট (Platelet/ Thrombocyte):

গঠন: এরা আকারে খুব ছোট, অনিয়মিত (গোলাকার, ডিম্বাকার, রডের মতো) এবং নিউক্লিয়াসবিহীন হয়। এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং এতে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তুসহ কিছু কোষীয় অঙ্গাণু থাকলেও এরা পূর্ণাঙ্গ কোষ নয়। এরা অস্থিমজ্জার মেগাক্যারিওসাইট নামক বৃহৎ কোষের সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষ খণ্ডিত হয়ে উৎপন্ন হয়।

সংখ্যা: পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা প্রায় ২.৫ লক্ষ (আড়াই লক্ষ)। অসুস্থ অবস্থায় বা সংক্রমণের সময় এই সংখ্যা বাড়তে পারে।

আয়ুষ্কাল: অণুচক্রিকার গড় আয়ু প্রায় ৫ থেকে ১০ দিন।

প্রধান কাজ: অণুচক্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রক্ত তঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা।

দাতা

গ্রুপ	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
O-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
O+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AB-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AB+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

গ্রহীতা

রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া (Blood Clotting Process):

দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে বা আঘাত লেগে রক্তনালি ছিঁড়ে গেলে রক্তপাত শুরু হয়। তখন রক্ত জমাট বাঁধার মাধ্যমে সেই রক্তপাত বন্ধ হয়। এটি একটি জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া:

১. অণুচক্রিকার ভূমিকা: যখন কোনো স্থান কেটে যায়, তখন সেখানকার অণুচক্রিকাগুলো বায়ুর সংস্পর্শে বা আঘাতপ্রাপ্ত অমসৃণ তলের সংস্পর্শে এসে সক্রিয় হয়, ভেঙে যায় এবং অনিয়মিত আকার ধারণ করে (চিত্র ৬.১১ দ্রষ্টব্য)। এই ভাঙা অণুচক্রিকাগুলো থেকে থ্রম্বোপ্লাস্টিন (Thromboplastin) নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়।

২. প্রথ্রম্বিন গঠন: নিঃসৃত থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তের ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca^{2+}) এবং অন্যান্য ক্লটিং ফ্যাক্টরের (যেগুলো রক্তরসেই থাকে) সহায়তায় রক্তরসের একটি নিষ্ক্রিয় প্রোটিন প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin)-কে সক্রিয় থ্রম্বিন (Thrombin) নামক এনজাইমে পরিণত করে।

প্রোথ্রম্বিন (নিষ্ক্রিয়) থ্রম্বোপ্লাস্টিন Ca^{2+} , অন্যান্য ফ্যাক্টর থ্রম্বিন (সক্রিয়)

৩. ফাইব্রিন জালক গঠন: উৎপন্ন সক্রিয় থ্রম্বিন তখন রক্তরসের আরেকটি দ্রবণীয় প্রোটিন ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen)-কে অদ্রবণীয় ফাইব্রিন (Fibrin) মনোমারে পরিণত করে। এই ফাইব্রিন মনোমারগুলো পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায় একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে লম্বা সূতার মতো জালক (Mesh) তৈরি করে।

ফাইব্রিনোজেন (দ্রবণীয়) থ্রম্বিন ফাইব্রিন (অদ্রবণীয় জালক)

৪. রক্তপিণ্ড গঠন (Clot formation): এই ফাইব্রিন জালক ক্ষতস্থানে একটি জালের মতো কাঠামো তৈরি করে, যার মধ্যে রক্তকণিকাগুলো (লোহিত, শ্বেত) এবং আরও অণুচক্রিকা আটকা পড়ে যায়। এর ফলে সেখানে একটি থকথকে পিণ্ড বা ক্লট (Clot) তৈরি হয়, যা রক্তক্ষরণ বন্ধ করে দেয়।

৫. প্রয়োজনীয় উপাদান: এই পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এবং এর জন্য প্রায় ১৩টি ভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টর, ভিটামিন কে (Vitamin K) এবং ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) অপরিহার্য।

গুরুত্ব:

যদি রক্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে অণুচক্রিকা না থাকে বা কোনো ক্লটিং ফ্যাক্টরের অভাব থাকে (যেমন: হিমোফিলিয়া রোগে), তাহলে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। এর ফলে সামান্য কেটে গেলেও অনেক বেশি রক্তপাত হতে পারে, যা রোগীর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- অণুচক্রিকা (Platelets) হলো রক্তের সবচেয়ে ছোট, নিউক্লিয়াসবিহীন, অনিয়মিত আকৃতির কোষীয় উপাদান।
- এরা অস্থিমজ্জার বৃহৎ কোষ থেকে উৎপন্ন হয়, সংখ্যায় প্রায় ২.৫ লক্ষ/ঘন মিমি এবং গড় আয়ু ৫-১০ দিন।
- অণুচক্রিকার প্রধান কাজ রক্ত তঞ্চনে (জমাট বাঁধা) সাহায্য করা।
- কেটে গেলে অণুচক্রিকা ভেঙে থ্রম্বোপ্লাস্টিন নিঃসরণ করে।
- থ্রম্বোপ্লাস্টিন Ca^{2+} এর সাহায্যে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে।
- থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেনকে (দ্রবণীয়) ফাইব্রিনে (অদ্রবণীয়) রূপান্তরিত করে।
- ফাইব্রিন জালক রক্তকণিকা আটকে রক্তপিণ্ড বা ক্লট তৈরি করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। (উদাহরণ: কেটে যাওয়া স্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হওয়া)।
- রক্ত তঞ্চনের জন্য ভিটামিন কে এবং ক্যালসিয়াম আয়ন (Ca^{2+}) অপরিহার্য।
- অণুচক্রিকা বা ক্লটিং ফ্যাক্টরের অভাব হলে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না, ফলে অতিরিক্ত রক্তপাত হয়।

পার্থক্য (আঘাত বা ক্ষতস্থানে রক্তকণিকার ভূমিকা):

রক্তকণিকার প্রকার	আঘাত বা ক্ষতস্থানে ভূমিকা
লোহিত রক্তকণিকা	রক্তপাতের সময় দেহ থেকে বের হয়ে যায়; ফাইব্রিন জালে আটকা পড়ে ক্লট গঠনে অংশ নেয়।
শ্বেত রক্তকণিকা	ক্ষতস্থানে জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সেখানে জমা হয়।
অণুচক্রিকা	ক্ষতস্থানে জমাট বেঁধে, ভেঙে গিয়ে থ্রম্বোপ্লাস্টিন নিঃসরণ করে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া শুরু করে।

রক্তের কাজ

রক্ত মানবদেহের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যা জীবন্ত কোষ এবং পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের আদান-প্রদান ঘটায়। এর দুটি প্রধান উপাদান – রক্তরস ও রক্তকণিকা – সম্মিলিতভাবে দেহের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে, যা জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য।

বিস্তারিত বর্ণনা:

দেহের সুস্থতা বজায় রাখতে এবং জীবন প্রক্রিয়া সচল রাখতে রক্ত নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে:

(ক) অক্সিজেন পরিবহন (Oxygen Transport): রক্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে অক্সিহিমোগ্লোবিন (HbO_2) নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এই অক্সিহিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে, যা কোষীয় শ্বসনের জন্য অপরিহার্য।

(খ) কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণ (Carbon Dioxide Transport): কোষে বিপাক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) একটি বর্জ্য পদার্থ। রক্ত এই CO_2 কে কোষ থেকে সংগ্রহ করে। প্রধানত রক্তরসের মাধ্যমে বাইকার্বোনেট আয়ন (HCO_3^-) রূপে এবং কিছুটা হিমোগ্লোবিন ও রক্তরসের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে এটি ফুসফুসে পরিবাহিত হয়। ফুসফুসে CO_2 রক্ত থেকে মুক্ত হয়ে নিঃশ্বাস বায়ুর সাথে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

(গ) খাদ্যসার পরিবহন (Nutrient Transport): পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য পরিপাক হওয়ার পর উৎপন্ন সরল খাদ্য উপাদান বা খাদ্যসার (যেমন: গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল, ভিটামিন, খনিজ লবণ) অন্ত্র থেকে শোষিত হয়ে রক্তে (মূলত রক্তরসে) মেশে। রক্ত এই খাদ্যসার দেহের প্রতিটি কোষে বহন করে নিয়ে যায়, যা কোষের পুষ্টি সাধন, বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) তাপের সমতা রক্ষা (Temperature Regulation): দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিপাকীয় কাজের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত হওয়ার সময় এই তাপকে সুষমভাবে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে দেহের সকল অঙ্গের

তাপমাত্রা প্রায় সমান থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (প্রায় $37^\circ C$ বা $98.6^\circ F$) বজায় থাকে। প্রয়োজনে ত্বকের রক্তনালির মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপ বিকিরণেও রক্ত সাহায্য করে।

(ঙ) বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন (Waste Transport): কোষীয় বিপাকের ফলে বিভিন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ (যেমন: ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন) উৎপন্ন হয়, যা দেহের জন্য ক্ষতিকর। রক্ত এই বর্জ্য পদার্থগুলো বিভিন্ন অঙ্গ ও কোষ থেকে সংগ্রহ করে রেচন অঙ্গ, প্রধানত বৃক্ক (কিডনি), বহন করে নিয়ে যায়। বৃক্ক রক্ত থেকে এই বর্জ্যগুলো ছেঁকে মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশন বা অপসারণ করে দেয়।

(চ) হরমোন পরিবহন (Hormone Transport): দেহের অন্তঃক্ষরা (Endocrine) গ্রন্থিগুলোতে উৎপন্ন হরমোন (Hormone) নামক রাসায়নিক বার্তাবাহক পদার্থগুলো সরাসরি রক্তে নিঃসৃত হয়। রক্ত এই হরমোনগুলোকে উৎপত্তিস্থল থেকে বহন করে দেহের দূরবর্তী নির্দিষ্ট লক্ষ্য অঙ্গে (Target Organ) পৌঁছে দেয় এবং সেসব অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ছ) রোগ প্রতিরোধ (Disease Prevention/ Immunity): রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো (WBCs) দেহের প্রতিরক্ষায় অত্যন্ত প্রহরীর মতো কাজ করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরা দেহে প্রবেশকারী রোগজীবাণু (যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস) ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। এছাড়া লিম্ফোসাইট নামক শ্বেত কণিকা অ্যান্টিবডি (Antibody) তৈরি করে নির্দিষ্ট জীবাণু বা তাদের নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থকে (Toxin) অকার্যকর করে দেয়। এভাবে রক্ত দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

(জ) রক্ত জমাট বাঁধা (Blood Clotting): দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে অণুচক্রিকা (Platelets) এবং রক্তরসে থাকা ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলোর (যেমন: ফাইব্রিনোজেন) সম্মিলিত ক্রিয়ায় রক্ত জমাট বাঁধে বা রক্ত তঞ্চন ঘটে। এর ফলে ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় এবং ওই পথে রোগজীবাণু প্রবেশের পথও রুদ্ধ হয়।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- রক্ত দেহের বহু অত্যাৱশ্যকীয় কাজ সম্পন্ন করে।
- লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে কোষে অক্সিজেন (O_2) পরিবহন করে।
- কোষ থেকে ফুসফুসে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবহন করে দেহ থেকে বের করে দেয়।
- পরিপাককৃত খাদ্যসার (গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদি) কোষে কোষে সরবরাহ করে।
- দেহের সর্বত্র তাপ ছড়িয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে।
- বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া ইত্যাদি) সংগ্রহ করে রেচন অঙ্গে (বৃক্ক) পৌঁছে দেয়।
- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির হরমোন বহন করে লক্ষ্য অঙ্গে নিয়ে যায়।
- শ্বেত কণিকা (ফ্যাগোসাইটোসিস ও অ্যান্টিবডি দ্বারা) রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
- অণুচক্রিকা ও ক্লটিং ফ্যাক্টর রক্ত জমাট বাঁধিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

রক্তের গ্রুপ বা রক্তের শ্রেণি

রক্তের গ্রুপ বা রক্তের শ্রেণি হলো মানুষের রক্তের একটি বিশেষ শ্রেণীবিভাগ। লোহিত রক্তকণিকার ঝিল্লিতে (পর্দায়) বিশেষ ধরনের অ্যান্টিজেন (Antigen) নামক প্রোটিন বা শর্করা জাতীয় পদার্থের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এবং রক্তরসে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি (Antibody)-র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। একজনের রক্ত অন্যজনের দেহে সঞ্চালনের (Blood transfusion) পূর্বে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে নেওয়া অত্যাৱশ্যক।

দাতা

গ্রুপ	O-	O+	B-	B+	A-	A+	AB-	AB+
গ্রহীতা								
O-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
O+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AB-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AB+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

বিস্তারিত বর্ণনা:

কেন একজনের রক্ত আরেকজনকে দেওয়া যায় বা যায় না, তা বুঝতে হলে রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

রক্তের গ্রুপিংয়ের ভিত্তি: অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি

- **অ্যান্টিজেন (Antigen):** লোহিত রক্তকণিকার কোষ পর্দার বাইরে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক (প্রোটিন বা শর্করা) উপাদান যা দেহে অ্যান্টিবডি তৈরিতে উদ্দীপনা যোগাতে পারে। ABO ব্লাড গ্রুপ সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি অ্যান্টিজেন হলো অ্যান্টিজেন A এবং অ্যান্টিজেন B।
- **অ্যান্টিবডি (Antibody):** রক্তরসে অবস্থিত এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় পদার্থ যা বহিরাগত কোনো অ্যান্টিজেনের (যেমন ভিন্ন গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিজেন বা রোগজীবাণু) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ABO সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি অ্যান্টিবডি হলো অ্যান্টিবডি 'a' (যা অ্যান্টিজেন A এর বিরুদ্ধে কাজ করে, Anti-A নামেও পরিচিত) এবং অ্যান্টিবডি 'b' (যা অ্যান্টিজেন B এর বিরুদ্ধে কাজ করে, Anti-B নামেও পরিচিত)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তির রক্তরসে সাধারণত এমন কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না যা তার নিজের লোহিত কণিকায় অবস্থিত অ্যান্টিজেনের সাথেই বিক্রিয়া করে। অর্থাৎ, যার রক্তে A অ্যান্টিজেন আছে, তার রক্তরসে কখনোই অ্যান্টিবডি 'a' (Anti-A) থাকবে না, বরং অ্যান্টিবডি 'b' (Anti-B) থাকবে।

ABO ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম:

অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় A ও B অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের প্রধান চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন – A, B, AB এবং O। এই সিস্টেমটি ABO ব্লাড গ্রুপ সিস্টেম নামে পরিচিত। এই সিস্টেম অনুসারে বিভিন্ন গ্রুপের বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো:

রক্তের গ্রুপ	লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন (Antigen)	রক্তরসে অ্যান্টিবডি (Antibody)
A	A	b (anti-B)

B	B	a (anti-A)
AB	A এবং B	কোনো অ্যান্টিবডি নেই
O	কোনো অ্যান্টিজেন নেই	a (anti-A) এবং b (anti-B)

বিশ্লেষণ:

- **গ্রুপ A:** লোহিত কণিকায় A অ্যান্টিজেন এবং রক্তরসে b (anti-B) অ্যান্টিবডি থাকে।
- **গ্রুপ B:** লোহিত কণিকায় B অ্যান্টিজেন এবং রক্তরসে a (anti-A) অ্যান্টিবডি থাকে।
- **গ্রুপ AB:** লোহিত কণিকায় A এবং B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে, কিন্তু রক্তরসে কোনো অ্যান্টিবডি (a বা b) থাকে না।
- **গ্রুপ O:** লোহিত কণিকায় কোনো অ্যান্টিজেন (A বা B) থাকে না, কিন্তু রক্তরসে উভয় অ্যান্টিবডি (a এবং b) থাকে।

রক্ত সঞ্চালনে গ্রুপিংয়ের গুরুত্ব:

রক্ত সঞ্চালনের সময় দাতা (Donor) ও গ্রহীতার (Recipient) রক্তের গ্রুপ অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কারণ, যদি দাতার লোহিত কণিকায় অবস্থিত অ্যান্টিজেনের সাথে গ্রহীতার রক্তরসে থাকা অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া হয়, তবে গ্রহীতার দেহে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এই বিক্রিয়ার ফলে দাতার লোহিত কণিকাগুলো জমাট বেঁধে যায় (Agglutination), যা রক্তনালি বন্ধ করে দিতে পারে এবং গ্রহীতার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

- **উদাহরণ:** যদি B গ্রুপের কোনো ব্যক্তিকে (যার রক্তে অ্যান্টিজেন B ও অ্যান্টিবডি a আছে) A গ্রুপের রক্ত (যার রক্তে অ্যান্টিজেন A ও অ্যান্টিবডি b আছে) দেওয়া হয়, তবে গ্রহীতার (B গ্রুপের ব্যক্তির) রক্তরসে থাকা অ্যান্টিবডি 'a' দাতার (A গ্রুপের ব্যক্তির) লোহিত কণিকার অ্যান্টিজেন A-এর সাথে বিক্রিয়া করবে এবং রক্তকণিকাগুলোকে জমাট বাঁধিয়ে ফেলবে।

তাই রক্ত আদান-প্রদানের পূর্বে অবশ্যই দাতা ও গ্রহীতার রক্ত গ্রুপ পরীক্ষা করে মিলিয়ে নিতে হয়, যাতে দাতার অ্যান্টিজেন ও গ্রহীতার অ্যান্টিবডির মধ্যে কোনো বিক্রিয়া না ঘটে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- রক্তের গ্রুপ হলো লোহিত কণিকার পৃষ্ঠে অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণীবিভাগ।
- ABO সিস্টেম অ্যান্টিজেন A, অ্যান্টিজেন B এবং অ্যান্টিবডি a (anti-A), অ্যান্টিবডি b (anti-B) এর উপর ভিত্তি করে গঠিত।
- বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার ১৯০১ সালে ABO গ্রুপ আবিষ্কার করেন।
- গ্রুপ A: অ্যান্টিজেন A, অ্যান্টিবডি b।
- গ্রুপ B: অ্যান্টিজেন B, অ্যান্টিবডি a।
- গ্রুপ AB: অ্যান্টিজেন A ও B, কোনো অ্যান্টিবডি নেই।
- গ্রুপ O: কোনো অ্যান্টিজেন নেই, অ্যান্টিবডি a ও b উভয়ই আছে।
- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপের সামঞ্জস্য থাকা অত্যাবশ্যিক।
- অসামঞ্জস্যপূর্ণ রক্ত দিলে গ্রহীতার দেহে রক্তকণিকা জমাট বেঁধে মারাত্মক বিপদ হতে পারে।

রক্তের গ্রুপের ভিত্তিতে রক্ত আদান-প্রদান, সর্বজনীন দাতা ও গ্রহীতা, Rh ফ্যাক্টর (Blood Donation Compatibility, Universal Donor/Recipient, Rh Factor)

নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের (Blood Transfusion) জন্য দাতা (যিনি রক্ত দেন) ও গ্রহীতার (যিনি রক্ত গ্রহণ করেন) রক্তের গ্রুপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যিক। ABO সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে কে কাকে রক্ত দিতে পারবে বা কার কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এই নিয়মের ভিত্তিতেই 'সর্বজনীন দাতা' ও 'সর্বজনীন গ্রহীতা' ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। এছাড়াও, রক্তের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপিং সিস্টেম হলো Rh ফ্যাক্টর, যা রক্ত সঞ্চালনে এবং গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিস্তারিত বর্ণনা:**ABO পদ্ধতিতে রক্ত আদান-প্রদান:**

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ABO সিস্টেমে রক্তের চারটি গ্রুপ (A, B, AB, O) নির্ধারিত হয় লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন (A, B) এবং রক্তরসে অ্যান্টিবডি (a, b) এর উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে। রক্ত সঞ্চালনের মূল নীতি হলো – দাতার লোহিত কণিকায় এমন কোনো অ্যান্টিজেন থাকা চলবে না যা গ্রহীতার রক্তরসের অ্যান্টিবডির সাথে বিক্রিয়া করে রক্তকণিকাকে জমাট বাঁধিয়ে দেবে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ABO সিস্টেমে রক্ত আদান-প্রদানের সারসংক্ষেপ নিচের সারণিতে দেখানো হলো:

সারণি: ABO পদ্ধতিতে মানুষের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার তালিকা

রক্তের গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A, AB	A, O
B	B, AB	B, O
AB	AB	A, B, AB, O
O	A, B, AB, O	O

সর্বজনীন দাতা (Universal Donor):

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, 'O' গ্রুপের রক্তের ব্যক্তির সব গ্রুপের (A, B, AB, O) ব্যক্তিদেরই রক্ত দিতে পারে। এর কারণ হলো, O গ্রুপের লোহিত রক্তকণিকায় কোনো অ্যান্টিজেন (A বা B) থাকে না, ফলে এটি গ্রহীতার রক্তরসে থাকা অ্যান্টিবডি a বা b এর সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না। এই জন্য O গ্রুপের রক্তকে সর্বজনীন দাতা বলা হয়।

সর্বজনীন গ্রহীতা (Universal Recipient):

আবার, সারণি অনুযায়ী 'AB' গ্রুপের ব্যক্তির সব গ্রুপের (A, B, AB, O) ব্যক্তিদের কাছ থেকেই রক্ত গ্রহণ করতে পারে। এর কারণ হলো, AB গ্রুপের ব্যক্তিদের রক্তরসে কোনো অ্যান্টিবডি (a বা b) থাকে না। ফলে দাতার রক্তে যে অ্যান্টিজেনই থাকুক না কেন (A, B, বা কোনোটিই না), গ্রহীতার রক্তরসে কোনো অ্যান্টিবডি না থাকায় সাধারণত কোনো মারাত্মক বিক্রিয়া হয় না। এই জন্য AB গ্রুপের রক্তকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়।

সীমাবদ্ধতা:

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'সর্বজনীন দাতা' বা 'সর্বজনীন গ্রহীতা'-র ধারণাটি কেবল জরুরি প্রয়োজনে বিবেচিত হয়। সবচেয়ে নিরাপদ হলো দাতা ও গ্রহীতার একই ABO গ্রুপের রক্ত সঞ্চালন করা। কারণ ABO সিস্টেম ছাড়াও রক্তে আরও অনেক অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি সিস্টেম (যেমন Rh ফ্যাক্টর, অন্যান্য গৌণ গ্রুপ) রয়েছে যা বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

Rh ফ্যাক্টর (Rh Factor):

ABO গ্রুপিংয়ের পাশাপাশি রক্ত সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হলো Rh ফ্যাক্টর। কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার ও উইনার রেসাস (Rhesus) নামক বানরের লোহিত কণিকায় এই বিশেষ ধরনের অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন, তাই একে Rh ফ্যাক্টর (রেসাস ফ্যাক্টর) বা Rh অ্যান্টিজেন (একে D-অ্যান্টিজেনও বলা হয়) বলে।

- **Rh পজিটিভ (Rh+):** যাদের রক্তের লোহিত কণিকায় Rh অ্যান্টিজেন থাকে, তাদের রক্তকে Rh পজিটিভ বলা হয়। বাংলাদেশের প্রায় ৯৭% মানুষ Rh পজিটিভ।
- **Rh নেগেটিভ (Rh-):** যাদের রক্তের লোহিত কণিকায় Rh অ্যান্টিজেন থাকে না, তাদের রক্তকে Rh নেগেটিভ বলা হয়।

Rh ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে ABO গ্রুপের সাথে মিলিয়ে রক্তের মোট ৮টি গ্রুপ পাওয়া যায়: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-।

গুরুত্ব:

রক্ত সঞ্চালনের সময় ABO গ্রুপের পাশাপাশি Rh গ্রুপও মেলানো অত্যন্ত জরুরি। একজন Rh নেগেটিভ (Rh-) ব্যক্তিকে যদি Rh পজিটিভ (Rh+) ব্যক্তির রক্ত দেওয়া হয়, তবে প্রথমবার সাধারণত সমস্যা না হলেও, গ্রহীতার দেহে Rh অ্যান্টিবডির (Anti-Rh বা Anti-D) সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আবার Rh+ রক্ত দেওয়া হলে এই অ্যান্টিবডি দাতার Rh+ কোষের সাথে মারাত্মক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। একইভাবে, Rh- মায়ের গর্ভে Rh+ সন্তান থাকলে গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে জটিলতা দেখা দিতে পারে (Erythroblastosis fetalis)।

রক্ত সঞ্চালনে সতর্কতা:

নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য ABO ও Rh গ্রুপিং ছাড়াও আরও কিছু পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যিক:

- **ক্রস ম্যাচিং (Cross Matching):** দাতার রক্তের লোহিত কণিকার সাথে গ্রহীতার রক্তরসের এবং গ্রহীতার লোহিত কণিকার সাথে দাতার রক্তরসের বিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা হয়।
- **স্ক্রিনিং টেস্ট (Screening Test):** দাতার রক্তে কোনো রক্তবাহিত মারাত্মক রোগ (যেমন: এইডস, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, সিলিফিস ইত্যাদি) আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করা হয়।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- ABO সিস্টেমে রক্ত আদান-প্রদান দাতার অ্যান্টিজেন ও গ্রহীতার অ্যান্টিবডি সামঞ্জস্যের উপর নির্ভরশীল।
- গ্রুপ O হলো 'সর্বজনীন দাতা' কারণ এতে A বা B অ্যান্টিজেন নেই।
- গ্রুপ AB হলো 'সর্বজনীন গ্রহীতা' কারণ এতে a বা b অ্যান্টিবডি নেই।
- জরুরি অবস্থা ছাড়া একই গ্রুপের রক্ত সঞ্চালন সবচেয়ে নিরাপদ।
- Rh ফ্যাক্টর হলো লোহিত কণিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিজেন; এর উপস্থিতি (Rh+) বা অনুপস্থিতি (Rh-) রক্তকে পজিটিভ বা নেগেটিভ নির্ধারণ করে।
- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য ABO ও Rh উভয় গ্রুপ মেলানো জরুরি।
- রক্ত সঞ্চালনের পূর্বে অবশ্যই ক্রস ম্যাচিং এবং রক্তবাহিত রোগের স্ক্রিনিং টেস্ট করা আবশ্যিক।

পার্থক্য (Rh পজিটিভ ও Rh নেগেটিভ):

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	Rh পজিটিভ (Rh+)	Rh নেগেটিভ (Rh-)
Rh অ্যান্টিজেন	লোহিত কণিকায় উপস্থিত।	লোহিত কণিকায় অনুপস্থিত।

Rh অ্যান্টিবডি	স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তরসে তৈরি হয় না।	স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তরসে থাকে না, কিন্তু Rh+ রক্ত পেলে বা Rh+ ঙ্গ গর্ভে এলে তৈরি হতে পারে।
রক্ত গ্রহণ	Rh+ এবং Rh- (বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া) উভয়ের রক্ত নিতে পারে।	শুধু Rh- রক্ত নিরাপদে নিতে পারে।
রক্ত দান	শুধু Rh+ ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে।	Rh+ এবং Rh- উভয়কেই রক্ত দিতে পারে (ABO সামঞ্জস্য সাপেক্ষে)।

রক্তদান ও রক্ত সঞ্চালন - সামাজিক গুরুত্ব ও বিবেচ্য বিষয়

- **রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion):** কোনো ব্যক্তির (গ্রহীতা) দেহে শিরা পথে অন্যের (দাতা) রক্ত বা রক্তের কোনো উপাদান (যেমন: রক্তরস, লোহিত কণিকা) প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াকে রক্ত সঞ্চালন বলে। এটি একটি জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসাব্যবস্থা।
- **রক্তদান (Blood Donation):** কোনো সুস্থ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় তার রক্ত অন্যের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য দান করাকে রক্তদান বলে। এই রক্ত সংগ্রহ করে ব্লাড ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয় এবং ৪৯২ অনুযায়ী রোগীদের সঞ্চালনের জন্য সরবরাহ করা হয়।

বিস্তারিত বর্ণনা:

রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা:

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন:

- **দুর্ঘটনা:** মারাত্মক দুর্ঘটনায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে।
- **শল্যচিকিৎসা (Surgery):** বড় অপারেশনের সময় রক্তক্ষরণের কারণে।

- **প্রসব:** প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য।
- **রক্তশূন্যতা (Anemia):** তীব্র রক্তশূন্যতায় রক্তের পরিমাণ বা হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য।
- **অন্যান্য রোগ:** থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার (যেমন: লিউকেমিয়া), হিমোফিলিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য নিয়মিত রক্তের প্রয়োজন হয়।

এইসব ক্ষেত্রে রোগীর দেহে রক্তের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেলে বা কোনো উপাদানের ঘাটতি হলে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়, যা রোগীর জীবন রক্ষা করে।

রক্তদানের গুরুত্ব:

- **জীবন রক্ষা:** রক্তদানের মাধ্যমে একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব। মানব রক্তের কোনো বিকল্প নেই, তাই স্বেচ্ছায় রক্তদানই পারে রক্তের চাহিদা পূরণ করতে।
- **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** রক্তদান একটি মহৎ কাজ এবং অন্যতম সেরা সামাজিক দায়বদ্ধতা। আমাদের সকলেরই উচিত রক্তদান সম্পর্কে জানা এবং অন্যকে উৎসাহিত করা। কারণ যেকোনো সময় আমাদের নিজেদের বা আপনজনের রক্তের প্রয়োজন হতে পারে।
- **দাতার সুস্থতা:** একজন সুস্থ মানুষ নির্দিষ্ট পরিমাণ (সাধারণত ৪৫০ মিলি) রক্ত দান করলে তার স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। দেহ খুব দ্রুত এই ঘাটতি পূরণ করে নেয়। প্রতিবার রক্তদানের পর দেহে নতুন রক্তকণিকা তৈরির প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত হয়। একজন সুস্থ ব্যক্তি সাধারণত প্রতি চার মাস অন্তর রক্তদান করতে পারেন।

রক্ত সঞ্চালনে সতর্কতা ও ঝুঁকি:

রক্ত সঞ্চালন জীবনরক্ষাকারী হলেও এতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। তাই অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক:

- **সঠিক গ্রুপিং ও ক্রসম্যাচিং:** রক্ত সঞ্চালনের পূর্বে অবশ্যই দাতা ও গ্রহীতার রক্তের ABO এবং Rh গ্রুপ সঠিকভাবে নির্ণয় করে মিলিয়ে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, সঞ্চালনের আগে দাতার লোহিত কণিকার সাথে গ্রহীতার রক্তরসের এবং গ্রহীতার লোহিত কণিকার সাথে দাতার রক্তরসের বিক্রিয়া পরীক্ষা বা ক্রস ম্যাচিং (Cross Matching) করা অত্যাবশ্যক। ভুল গ্রুপের রক্ত দিলে গ্রহীতার দেহে

রক্তকণিকা জমাট বেঁধে তীব্র প্রতিক্রিয়া (যেমন: কিডনি বিকল) এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

- **রোগের সংক্রমণ:** রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দাতার দেহ থেকে গ্রহীতার দেহে মারাত্মক রোগ সংক্রমিত হতে পারে, যেমন - এইডস (HIV), হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিবিলিস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। তাই রক্ত গ্রহণের পূর্বে দাতার রক্তে এসব রোগের জীবাণু আছে কিনা, তা অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা (Screening Test) করে নিশ্চিত হওয়া অপরিহার্য। পেশাদার রক্তদাতা বা অচেনা ও অজানা উৎস থেকে রক্ত গ্রহণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
- **অন্যান্য জটিলতা:** জ্বর, কাঁপুনি, অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিও ঘটতে পারে।

রক্তদানকে উৎসাহিতকরণ:

- বর্তমানে স্বেচ্ছায় রক্তদানকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠন ও ব্লাড ব্যাংকগুলো বিশেষ দিবস (যেমন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস - ১৪ই জুন) বা বিশেষ অনুষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে এবং আগের তুলনায় মানুষ রক্তদানে অনেক বেশি আগ্রহী হচ্ছে ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাচ্ছে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- রক্ত সঞ্চালন হলো অন্যের দেহে রক্ত বা রক্তের উপাদান প্রবেশ করানো, যা জীবন রক্ষাকারী।
- রক্তদান হলো স্বেচ্ছায় অন্যের জন্য রক্ত প্রদান করা।
- দুর্ঘটনা, অপারেশন, প্রসব, রক্তশূন্যতা, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি কারণে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়।
- রক্তদান একটি নিরাপদ ও মহৎ কাজ; সুস্থ ব্যক্তি ৪ মাস পর পর রক্ত দিতে পারেন।
- রক্ত সঞ্চালনের পূর্বে অবশ্যই ABO ও Rh গ্রুপ মেলানো এবং ক্রস ম্যাচিং করা আবশ্যিক।
- দাতার রক্তে এইডস, হেপাটাইটিস বি/সি ইত্যাদি রোগের জীবাণু আছে কিনা তা স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

- অসঙ্গতিপূর্ণ বা অপরীক্ষিত রক্ত সঞ্চালন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।
- স্বেচ্ছায় রক্তদানকে উৎসাহিত করা এবং নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করা একটি সামাজিক দায়িত্ব।

পার্থক্য (রক্ত সঞ্চালনে করণীয় ও বর্জনীয়):

কার্যকলাপ	করণীয় (Do's)	বর্জনীয় (Don'ts)
সঞ্চালনের পূর্বে	ABO ও Rh গ্রুপ মেলানো, ক্রস ম্যাচিং করা, দাতার রক্ত স্ক্রিনিং করা।	পরীক্ষা বা ম্যাচিং ছাড়া রক্ত সঞ্চালন করা।
রক্তের উৎস	সরকার অনুমোদিত ব্লাড ব্যাংক বা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রক্ত সংগ্রহ করা।	পেশাদার রক্তদাতা বা অচেনা, অপরীক্ষিত উৎস থেকে রক্ত নেওয়া।
রক্তদান	সুস্থ থাকলে প্রতি ৪ মাস পর পর স্বেচ্ছায় রক্তদান করা।	খুব ঘন ঘন রক্তদান করা, অসুস্থ অবস্থায় রক্তদান করা।
সচেতনতা	রক্তদান ও নিরাপদ সঞ্চালন সম্পর্কে জানা ও অন্যকে জানানো।	ভুল তথ্য বা গুজবে কান দেওয়া।

হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ

হৃৎপিণ্ড (Heart) মানবদেহের বক্ষগহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার, ফাঁপা, পেশিবহুল ও পাম্পযন্ত্রের মতো অঙ্গ। এটি অবিরাম ছন্দময়ভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium) নামক একটি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে, যা এটিকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

হৃৎপিণ্ড একটি জটিল অথচ সুসংগঠিত অঙ্গ, যার গঠন রক্ত সঞ্চালনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর (Heart Wall):

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর মূলত তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত:

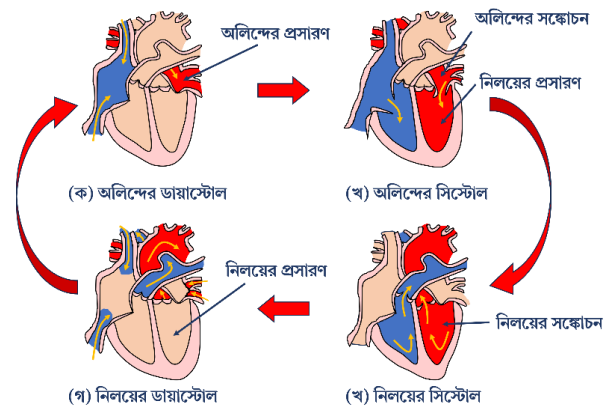
১. **বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম (Epicardium):** এটি হৃৎপিণ্ডের সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর, যা মূলত যোজক কলা (Connective tissue) দ্বারা গঠিত এবং এতে চর্বি জমা থাকতে পারে। এটি পেরিকার্ডিয়ামের ভিসেরাল স্তরের সাথে অভিন্ন।

২. **মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium):** এটি হৃৎপিণ্ডের মাঝের স্তর এবং সবচেয়ে পুরু। এটি এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক হৃদপেশি (Cardiac muscle) দ্বারা গঠিত। এই পেশিস্তরের ছন্দময় ও শক্তিশালী সংকোচনের ফলেই হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করতে পারে।

৩. **অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium):** এটি হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে ভেতরের স্তর, যা হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোকে এবং কপাটিকাগুলোকে আবৃত করে রাখে। এটি অত্যন্ত পাতলা একটি স্তর।

হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ (Chambers of the Heart):

মানব হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠে বা কুঠুরিতে বিভক্ত:



উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি:

- **ডান অলিন্দ (Right Atrium):** দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।
- **বাম অলিন্দ (Left Atrium):** ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। অলিন্দ দুটির প্রাচীর বিন্দুর প্রাচীরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। ডান ও বাম অলিন্দ আন্তঃঅলিন্দ পর্দা দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকে।

নিচের প্রকোষ্ঠ দুটি:

- **ডান নিলয় (Right Ventricle):** ডান অলিন্দ থেকে আসা কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে এবং তা ফুসফুসে পাম্প করে পাঠায়।
- **বাম নিলয় (Left Ventricle):** বাম অলিন্দ থেকে আসা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে এবং তা মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে পাম্প করে পাঠায়। নিলয় দুটির প্রাচীর, বিশেষ করে বাম নিলয়ের প্রাচীর, অলিন্দের প্রাচীরের চেয়ে অনেক পুরু ও শক্তিশালী হয়, কারণ এদেরকে অনেক বেশি চাপে রক্ত পাম্প করতে হয়। ডান ও বাম নিলয় আন্তঃনিলয় পর্দা দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকে।

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা (Valves of the Heart):

হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর মাঝে এবং নিলয় থেকে বহির্গত প্রধান ধমনিগুলোর মুখে ভালভ বা কপাটিকা নামক পর্দা বা দরজা থাকে। এগুলো রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে, অর্থাৎ রক্তকে শুধু সামনের দিকে যেতে দেয় কিন্তু পেছনের দিকে ফিরতে বাধা দেয়।

অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা (Atrioventricular Valves):

- **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (Tricuspid Valve):** ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এর তিনটি পর্দা বা পত্র (cusp) থাকে।
- **বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকা (Bicuspid/Mitral Valve):** বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এর দুটি পর্দা বা পত্র থাকে।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা (Semilunar Valves):

- **পালমোনারি কপাটিকা (Pulmonary Valve):** ডান নিলয় এবং ফুসফুসীয় ধমনির সংযোগস্থলে অবস্থিত।
- **অ্যাওর্টিক কপাটিকা (Aortic Valve):** বাম নিলয় এবং মহাধমনির (Aorta) সংযোগস্থলে অবস্থিত।

কাজ (Function):

হৃৎপিণ্ডের প্রধান এবং একমাত্র কাজ হলো একটি পাম্পযন্ত্র হিসেবে কাজ করা। এটি অবিরাম সংকুচিত (সিস্টোল) ও প্রসারিত (ডায়াস্টোল) হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্তকে ফুসফুসে প্রেরণ করে অক্সিজেন যুক্ত করার জন্য এবং

অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে মহাধমনির মাধ্যমে সারা দেহে সঞ্চালিত করে প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। এই প্রক্রিয়া সারাজীবন ধরে চলতে থাকে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরে অবস্থিত একটি ৪-প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট পেশিবহুল পাম্প অঙ্গ।
- এটি পেরিকার্ডিয়াম নামক দ্বি-স্তরীয় পর্দা দ্বারা আবৃত।
- হৃৎপ্রাচীর তিনটি স্তরে গঠিত: এপিকার্ডিয়াম (বহিঃস্তর), মায়োকার্ডিয়াম (মধ্যস্তর, পেশিময়) ও এন্ডোকার্ডিয়াম (অন্তঃস্তর)।
- চারটি প্রকোষ্ঠ হলো: ডান অলিন্দ, বাম অলিন্দ (উপরে, রক্ত গ্রহণ করে) এবং ডান নিলয়, বাম নিলয় (নিচে, রক্ত পাম্প করে)।
- কপাটিকাগুলো রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে: ট্রাইকাসপিড (ডান অলিন্দ-নিলয়), বাইকাসপিড/মাইট্রাল (বাম অলিন্দ-নিলয়) এবং সেমিলুনার (পালমোনারি ও অ্যাওর্টিক)।
- হৃৎপিণ্ডের প্রধান কাজ হলো সারা দেহে নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্ত সঞ্চালন করা।

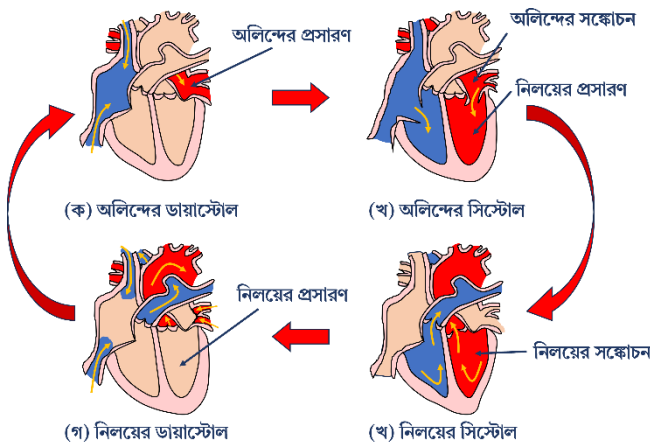
পার্থক্য (অলিন্দ ও নিলয়):

বৈশিষ্ট্য	অলিন্দ (Atrium)	নিলয় (Ventricle)
অবস্থান	হৃৎপিণ্ডের উপরের দিকের প্রকোষ্ঠ।	হৃৎপিণ্ডের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ।
প্রাচীরের পুরুত্ব	তুলনামূলকভাবে পাতলা।	তুলনামূলকভাবে পুরু (বিশেষ করে বাম নিলয়)।
প্রধান কাজ	হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসা রক্ত গ্রহণ করা।	হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে পাম্প করে পাঠানো।
সংযুক্ত কপাটিকা	ট্রাইকাসপিড (ডান), বাইকাসপিড	পালমোনারি (ডান), অ্যাওর্টিক (বাম) - বহির্গমন পথে।

	(বাম) - প্রবেশ পথে।	
চাপ	রক্ত গ্রহণকালে কম চাপযুক্ত।	রক্ত পাম্প করার সময় উচ্চ চাপ সৃষ্টি করে।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি (হৃদচক্র)

হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পযন্ত্রের মতো কাজ করে অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত রাখে। হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (Systole - সিস্টোল) ও একবার প্রসারণকে (Diastole - ডায়াস্টোল) একত্রে হৃদস্পন্দন (Heartbeat) বলে। যে পর্যায়ক্রমিক ঘটনাগুলোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের সংকোচন ও প্রসারণ এবং কপাটিকাগুলোর খোলা ও বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে রক্তপ্রবাহ চালিত হয়, তাকে হৃদচক্র (Cardiac Cycle) বলে। এই চক্রাকার কাজটি সারাজীবন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।



বিস্তারিত বর্ণনা:

একটি সম্পূর্ণ হৃদচক্রে মূলত নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক ঘটনাগুলো ঘটে:

১. অলিন্দের প্রসারণ (Atrial Diastole) ও রক্ত গ্রহণ:

- এই পর্যায়ে হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি, অর্থাৎ ডান অলিন্দ এবং বাম অলিন্দ, প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে।
- একই সময়ে, দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) সমৃদ্ধ রক্ত উর্ধ্ব মহাশিরা

(Superior Vena Cava) ও নিম্ন মহাশিরা (Inferior Vena Cava) দিয়ে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে।

- ঠিক একই সাথে, ফুসফুস থেকে অক্সিজেন (O_2) সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরার (Pulmonary Veins) মাধ্যমে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।
- এভাবে উভয় অলিন্দ রক্ত দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে।

২. অলিন্দের সংকোচন (Atrial Systole) ও নিলয়ে রক্ত প্রবেশ:

- যখন অলিন্দ দুটি রক্ত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এরা একসাথে সংকুচিত হয় (Atrial Systole)।
- এই সংকোচনের সময় নিলয় দুটি প্রসারিত অবস্থায় (Ventricular Diastole) থাকে।
- অলিন্দের সংকোচনের ফলে এদের অভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি পায় এবং অলিন্দ ও নিলয়ের সংযোগস্থলের কপাটিকাগুলো খুলে যায়।
- ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মধ্যকার ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (Tricuspid valve) খুলে যায় এবং ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে।
- বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যকার বাইকাসপিড বা মাইট্রাল কপাটিকা (Bicuspid/Mitral valve) খুলে যায় এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে।
- নিলয় দুটি রক্ত দ্বারা পূর্ণ হওয়ার পরপরই ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়, যাতে নিলয়ের সংকোচনের সময় রক্ত আবার অলিন্দে ফিরে যেতে না পারে।

৩. নিলয়ের সংকোচন (Ventricular Systole) ও রক্ত নিষ্ক্ষেপ:

- অলিন্দের সংকোচনের ঠিক পরেই নিলয় দুটি একসাথে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে সংকুচিত হয় (Ventricular Systole)। এই সময় অলিন্দ দুটি আবার প্রসারিত হতে শুরু করে (Atrial Diastole) এবং পুনরায় রক্ত গ্রহণ করতে থাকে।
- নিলয়ের প্রবল সংকোচনের ফলে এর ভিতরের চাপ

অত্যন্ত বেড়ে যায়, যার দুটি প্রভাব পড়ে:

- (ক) ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা দুটি সজোরে বন্ধ হয়ে যায় (এতে 'লাব' নামক প্রথম হৃদশব্দ উৎপন্ন হয়)।
- (খ) নিলয় থেকে বহির্গত প্রধান ধমনিগুলোর মুখে থাকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা (Semilunar valves) খুলে যায়।
- ডান নিলয় সংকুচিত হয়ে CO_2 সমৃদ্ধ রক্তকে পালমোনারি কপাটিকার (Pulmonary valve) মাধ্যমে ফুসফুসীয় ধমনিতে (Pulmonary artery) পাম্প করে, যা এই রক্তকে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে নিয়ে যায়।
- বাম নিলয় সংকুচিত হয়ে O_2 সমৃদ্ধ রক্তকে অ্যাওটিক কপাটিকার (Aortic valve) মাধ্যমে মহাধমনিতে (Aorta) পাম্প করে, যা এরপর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. নিলয়ের প্রসারণ (Ventricular Diastole) ও চক্রের পুনরাবৃত্তি:

- নিলয় থেকে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর নিলয় দুটি প্রসারিত হতে শুরু করে (Ventricular Diastole)।
- নিলয়ের চাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে ফুসফুসীয় ধমনি ও মহাধমনির মুখে থাকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা দুটি বন্ধ হয়ে যায় (এতে 'ডাব' নামক দ্বিতীয় হৃদশব্দ উৎপন্ন হয়), যাতে রক্ত আবার নিলয়ে ফিরে আসতে না পারে।
- নিলয় প্রসারিত হওয়ার সময় অলিন্দ দুটিও প্রসারিত অবস্থায় রক্ত গ্রহণ করতে থাকে এবং অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা খুলে গেলে নিলয় আবার রক্ত দ্বারা পূর্ণ হতে শুরু করে।
- এভাবেই সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের পর্যায়ক্রমিক চক্র সম্পন্ন হয় এবং একটি নতুন হৃদচক্র শুরু হয়।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- হৃদচক্র হলো হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংকোচন (সিস্টোল) ও প্রসারণ (ডায়াস্টোল)।
- **অলিন্দ প্রসারণ:** অলিন্দদ্বয় প্রসারিত হয়ে রক্ত গ্রহণ করে (ডান অলিন্দে CO_2 যুক্ত রক্ত, বাম অলিন্দে O_2 যুক্ত রক্ত)।
- **অলিন্দ সংকোচন:** অলিন্দদ্বয় সংকুচিত হয়ে ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা খুলে দেয়, রক্ত প্রসারিত নিলয়ে

প্রবেশ করে।

- **নিলয় সংকোচন:** নিলয়দ্বয় সংকুচিত হয়, ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়, পালমোনারি ও অ্যাওটিক কপাটিকা খুলে যায়।
- ডান নিলয় CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনিতে এবং বাম নিলয় O_2 যুক্ত রক্ত মহাধমনিতে পাম্প করে।
- **নিলয় প্রসারণ:** নিলয়দ্বয় প্রসারিত হয়, পালমোনারি ও অ্যাওটিক কপাটিকা বন্ধ হয় এবং চক্র পুনরায় শুরু হয়।
- কপাটিকাগুলো রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে।

পার্থক্য (সিস্টোল ও ডায়াস্টোল):

বৈশিষ্ট্য	সিস্টোল (Systole - সংকোচন)	ডায়াস্টোল (Diastole - প্রসারণ)
সংজ্ঞা	হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংকোচন।	হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের প্রসারণ বা শিথিলায়ন।
প্রকোষ্ঠের আয়তন	কমে যায়।	বেড়ে যায় (রক্ত দ্বারা পূর্ণ হয়)।
অভ্যন্তরীণ চাপ	বৃদ্ধি পায়।	হ্রাস পায়।
রক্তের চলাচল	প্রকোষ্ঠ থেকে রক্ত বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।	প্রকোষ্ঠে রক্ত প্রবেশ করে।
নিলয়ের পর্যায়ে	অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা খোলা।	অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা খোলা, অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা বন্ধ।

হৃৎপিণ্ডের কাজ

হৃৎপিণ্ড হলো মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় পাম্পযন্ত্র। এর প্রধান কাজ হলো ছন্দবদ্ধ সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সচল রাখা, যার ফলে দেহের প্রতিটি কোষে প্রয়োজনীয় উপাদান পৌঁছায় এবং কোষ থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারিত হয়।

বিস্তারিত বর্ণনা:

হৃৎপিণ্ড একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ যা দেহের জীবন প্রক্রিয়া চালু রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এর প্রধান কাজগুলো হলো:

১. রক্ত পাম্প করা: হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো একটি পেশিবহুল পাম্প হিসেবে কাজ করা। এর মায়োকার্ডিয়াম স্তরের ছন্দোবদ্ধ সংকোচন (সিস্টোল) ও প্রসারণের (ডায়াস্টোল) মাধ্যমে রক্ত ধমনি পথে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিরা পথে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এই নিরবচ্ছিন্ন পাম্পিং ক্রিয়ার ফলেই সমগ্র সংবহনতন্ত্রে রক্তপ্রবাহ বজায় থাকে।

২. অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্ত পৃথক রাখা: মানব হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ (ডান অলিন্দ, বাম অলিন্দ, ডান নিলয়, বাম নিলয়) সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে (আন্তঃঅলিন্দ ও আন্তঃনিলয় পর্দা দ্বারা)। হৃৎপিণ্ডের ডান দিক (ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়) শুধুমাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত বা অক্সিজেনবিহীন রক্ত গ্রহণ ও পাম্প করে (ফুসফুসে পাঠায়)। অপরদিকে, হৃৎপিণ্ডের বাম দিক (বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়) শুধুমাত্র অক্সিজেনযুক্ত রক্ত গ্রহণ ও পাম্প করে (সারা দেহে পাঠায়)। এই সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে হৃৎপিণ্ডের ভেতরে অক্সিজেনযুক্ত এবং অক্সিজেনবিহীন রক্তের মিশ্রণ ঘটানো কোনো সুযোগ থাকে না।

৩. দক্ষ সংবহন নিশ্চিত করা: অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্ত মিশ্রিত না হওয়ার কারণে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেহের কোষে কোষে বিশুদ্ধ বা পর্যাপ্ত অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এটি দেহের উচ্চ বিপাকীয় হার বজায় রাখতে এবং কার্যকরভাবে শক্তি উৎপাদন করতে সাহায্য করে।

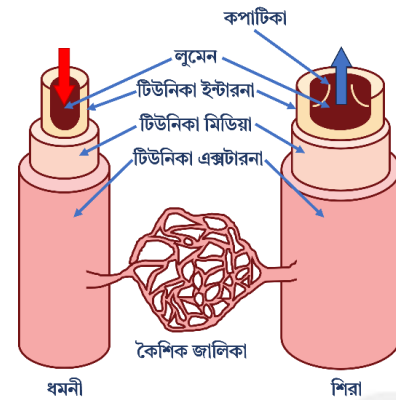
যা যা মনে রাখতে হবে:

- হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান পাম্পযন্ত্র হিসেবে কাজ করে।
- এটি ছন্দবদ্ধ সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্তপ্রবাহ সচল রাখে।
- হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ সম্পূর্ণ বিভক্ত থাকায় অক্সিজেনযুক্ত ও অক্সিজেনবিহীন রক্ত পৃথক থাকে।

- এই পৃথকীকরণ রক্তের মিশ্রণ রোধ করে এবং সংবহনতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
- হৃৎপিণ্ড দেহের প্রতিটি কোষে রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করে।

রক্তবাহিকা ও ধমনি

- **রক্তবাহিকা (Blood Vessel):** যেসকল নালিপথের ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত বা সংবাহিত হয়, তাদের রক্তনালি বা রক্তবাহিকা বলে। মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রে এই নালিকাগুলো হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাদান পৌঁছে দেয় এবং বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়ে আনে। গঠন, আকৃতি এবং কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা প্রধানত তিন ধরনের হয় – ধমনি (Artery), শিরা (Vein) এবং কৈশিক জালিকা (Capillary)।
- **ধমনি (Artery):** যে সকল রক্তবাহিকা হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বহন করে নিয়ে যায়, তাদের ধমনি বলে। সাধারণত ধমনি অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বহন করে, তবে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে।

**বিস্তারিত বর্ণনা:**

ধমনি রক্ত সংবহনতন্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

- **কাজ:** হৃৎপিণ্ডের নিলয় (Ventricles) থেকে রক্তকে দেহের দূরবর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়াই ধমনির প্রধান কাজ। সাধারণত, বাম নিলয় থেকে উৎপন্ন মহাধমনি ও তার শাখা-প্রশাখা অক্সিজেনযুক্ত (O_2) রক্ত সারা দেহে সরবরাহ করে।

- **ব্যতিক্রম - ফুসফুসীয় ধমনি:** একটি প্রধান ব্যতিক্রম হলো ফুসফুসীয় ধমনি (Pulmonary Artery)। এটি ডান নিলয় থেকে উৎপন্ন হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত (CO_2) বা অক্সিজেনবিহীন রক্ত ফুসফুসে বহন করে নিয়ে যায় পরিশোধিত (অক্সিজেন যুক্ত) হওয়ার জন্য।
- **গঠন:** ধমনির প্রাচীর বেশ পুরু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ হৃৎপিণ্ড থেকে উচ্চ চাপে রক্ত এসে ধমনিতে প্রবেশ করে। ধমনির প্রাচীর মূলত তিনটি স্তরে গঠিত:

(i) **টিউনিকা এক্সটার্ণা (Tunica Externa):** এটি ধমনির সবচেয়ে বাইরের স্তর, যা মূলত তন্তুময় যোজক কলা (Fibrous connective tissue) দ্বারা গঠিত। এটি ধমনিকে রক্ষা করে এবং আশপাশের টিস্যুর সাথে আটকে রাখতে সাহায্য করে।

(ii) **টিউনিকা মিডিয়া (Tunica Media):** এটি মাঝের স্তর এবং সবচেয়ে পুরু। এটি অনৈচ্ছিক পেশি (Smooth muscle) এবং স্থিতিস্থাপক তন্তু (Elastic fibres) দ্বারা গঠিত। পেশির সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে ধমনি তার ব্যাস পরিবর্তন করে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং স্থিতিস্থাপক তন্তুর কারণে উচ্চ রক্তচাপ সহ্য করতে পারে ও রক্তের স্পন্দন বজায় রাখতে পারে।

(iii) **টিউনিকা ইন্টার্না (Tunica Interna/ Intima):** এটি ধমনির সবচেয়ে ভেতরের স্তর, যা একটি পাতলা সরল আবরণী কলার (Endothelium) স্তর দিয়ে গঠিত। এটি রক্তের সংস্পর্শে থাকে এবং রক্ত প্রবাহের জন্য একটি মসৃণ পথ তৈরি করে।

বৈশিষ্ট্য:

- **প্রাচীর:** পুরু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক।
- **গহ্বর (Lumen):** শিরার তুলনায় এর ভেতরের গহ্বর বা নালিপথ সরু হয়।
- **কপাটিকা (Valve):** সাধারণত ধমনিতে কোনো কপাটিকা থাকে না (ব্যতিক্রম: হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হওয়ার মুখে থাকা অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা – অ্যাওটিক ও পালমোনারি ভালভ)। উচ্চ রক্তচাপের কারণে রক্ত একদিকেই প্রবাহিত হয়, পেছনে ফেরার সুযোগ পায় না।

- **নাড়িস্পন্দন (Pulse):** হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি সংকোচনের (সিস্টোল) সময় যখন সবেগে রক্ত ধমনিতে প্রবেশ করে, তখন ধমনি প্রাচীর প্রসারিত হয় এবং পরক্ষণেই আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে (স্থিতিস্থাপকতার কারণে)। ধমনি প্রাচীরের এই ছন্দময় প্রসারণ ও সংকোচনকে নাড়িস্পন্দন বা পালস বলে। এটি সাধারণত হাতের কবজি বা গলার পাশে অনুভব করা যায়। ধমনিগাত্রেয় সংকোচন, প্রসারণ এবং স্থিতিস্থাপকতাই নাড়িস্পন্দনের প্রধান কারণ।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- রক্তবাহিকা হলো নালি যার মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় (ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি)।
- ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত বহন করে নিয়ে যায়।
- ধমনি সাধারণত অক্সিজেনযুক্ত (O_2) রক্ত বহন করে (ব্যতিক্রম: ফুসফুসীয় ধমনি CO_2 যুক্ত রক্ত বহন করে)।
- ধমনির প্রাচীর তিনটি স্তর (টিউনিকা এক্সটার্ণা, মিডিয়া, ইন্টার্না) নিয়ে গঠিত; এটি পুরু, পেশিময় ও স্থিতিস্থাপক।
- ধমনির গহ্বর সরু এবং এতে সাধারণত কপাটিকা থাকে না।
- ধমনিতে রক্ত উচ্চ চাপে প্রবাহিত হয়।
- হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সাথে ধমনি প্রাচীরের ছন্দময় প্রসারণ ও সংকোচনই হলো নাড়িস্পন্দন বা পালস।

পার্থক্য (ধমনি প্রাচীরের বিভিন্ন স্তর):

স্তর	অবস্থান	প্রধান গঠন উপাদান	প্রধান কাজ
টিউনিকা এক্সটার্ণা	বাইরের স্তর	তন্তুময় যোজক কলা	রক্ষা করা, অবলম্বন দেওয়া
টিউনিকা মিডিয়া	মধ্য স্তর	অনৈচ্ছিক পেশি, স্থিতিস্থাপক তন্তু	দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা দান, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

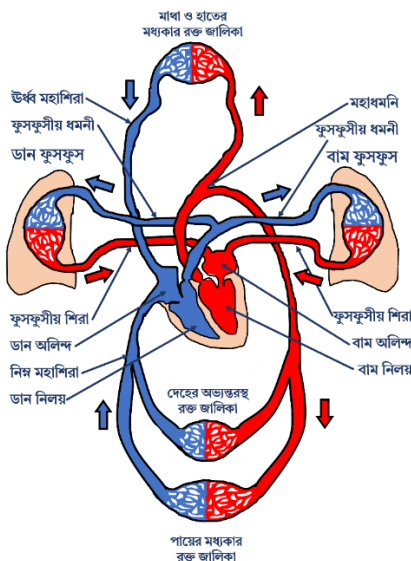
টিউনিকা ইন্টার্না	ভেতরের স্তর	সরল আবরণী কলা (এন্ডোথেলিয়াম)	রক্তপ্রবাহের জন্য মসৃণ পথ তৈরি
----------------------	----------------	-------------------------------------	--------------------------------------

শিরা ও কৈশিক জালিকা

- **শিরা (Vein):** যেসব রক্তনালি দেহের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ থেকে রক্ত বহন করে হৃৎপিণ্ডের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, তাদের শিরা বলে। সাধারণত শিরা কার্বন ডাইঅক্সাইডসমৃদ্ধ (অক্সিজেনবিহীন) রক্ত বহন করে, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে।
- **কৈশিক জালিকা (Capillary):** কৈশিক জালিকা বা কৈশিকনালি হলো চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি, যা ধমনি ও শিরার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী জালক তৈরি করে এবং দেহের প্রতিটি কোষের সংস্পর্শে থাকে। এদের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় রক্ত ও কোষের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের আদান-প্রদান এখানেই ঘটে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

ধমনির পাশাপাশি শিরা এবং কৈশিক জালিকা রক্ত সংবহনতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ।



(খ) শিরা (Vein):

- **কাজ:** দেহের বিভিন্ন কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন রক্ত প্রথমে উপশিরায় (Venule) আসে এবং পরে এই

উপশিরাগুলো মিলিত হয়ে শিরা (Vein) গঠন করে। শিরাগুলো আরও মিলিত হয়ে মহাশিরা (Vena Cava) গঠন করে, যা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে ফিরিয়ে আনে। সাধারণত, দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত (CO_2) বা অক্সিজেনবিহীন রক্ত বহন করাই শিরার কাজ।

- **ব্যতিক্রম-ফুসফুসীয় শিরা:** ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary Vein) এর ব্যতিক্রম। এরা ফুসফুস থেকে অক্সিজেনযুক্ত (O_2) রক্ত বহন করে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে নিয়ে আসে।
- **গঠন:** শিরার প্রাচীরও ধমনির মতো তিনটি স্তর (টিউনিকা এক্সটের্না, মিডিয়া, ইন্টার্না) নিয়ে গঠিত, তবে ধমনির তুলনায় শিরার প্রাচীর পাতলা, কম স্থিতিস্থাপক এবং কম পেশিময় হয়। এর কারণ শিরাতে রক্তের চাপ ধমনির চেয়ে অনেক কম থাকে।
- **বৈশিষ্ট্য:**

প্রাচীর: ধমনির চেয়ে পাতলা, কম দৃঢ় ও কম স্থিতিস্থাপক।

গহ্বর (Lumen): ধমনির তুলনায় এর ভেতরের গহ্বর বা নালিপথ বেশি চওড়া হয়।

কপাটিকা (Valve): শিরার ভেতরে, বিশেষ করে নিম্ন অঙ্গের শিরাগুলোতে, কপাটিকা বা ভালভ থাকে। এই কপাটিকাগুলো রক্তের একমুখী প্রবাহ (হৃৎপিণ্ডের দিকে) নিশ্চিত করে এবং নিম্নচাপ ও অভিকর্ষের কারণে রক্তকে উল্টো দিকে বা নিচের দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়।

(গ) কৈশিক জালিকা (Capillary):

- **গঠন:** ধমনি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর নালিতে পরিণত হয়, এরাই কৈশিক জালিকা। এরা চুলের চেয়েও সরু এবং এদের প্রাচীর মাত্র এক স্তর পাতলা এন্ডোথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। অসংখ্য কৈশিক জালিকা একত্রিত হয়ে জালের মতো গঠন তৈরি করে দেহের প্রতিটি সজীব কোষের চারপাশে পরিব্যাপ্ত থাকে।
- **সংযোগ:** কৈশিক জালিকা একদিকে ক্ষুদ্রতম ধমনি (Arteriole) এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম শিরার (Venule) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

- **কাজ:** কৈশিক জালিকার প্রধান কাজ হলো রক্ত এবং দেহের কোষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ঘটানো। এর অত্যন্ত পাতলা প্রাচীর ভেদ করে:

1. রক্ত থেকে অক্সিজেন (O_2), খাদ্যসার, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষের মধ্যে প্রবেশ করে।
2. কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও অন্যান্য বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কৈশিক নালির রক্তে প্রবেশ করে, যা পরবর্তীতে শিরার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহ থেকে অপসারিত হয়। এককথায়, কৈশিক জালিকা হলো রক্ত সংবহনতন্ত্রের সেই অংশ যেখানে রক্ত এবং টিস্যুর মধ্যে আসল আদান-প্রদানের কাজটি সম্পন্ন হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ফুসফুসীয় ধমনি ও শিরা ব্যতীত অন্যান্য ধমনি ও শিরা উভয়তেই রক্তে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় মিশে থাকতে পারে, যা মূলত গ্যাসীয় বিনিময়ের অবস্থা ও পরিবহনের ধরনের উপর নির্ভরশীল।

যা যা মনে রাখতে হবে:

শিরা:

- দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে বহন করে আনে, সাধারণত CO_2 যুক্ত রক্ত।
- ব্যতিক্রম: ফুসফুসীয় শিরা O_2 যুক্ত রক্ত বহন করে।
- প্রাচীর ধমনির চেয়ে পাতলা ও কম স্থিতিস্থাপক; গহ্বর চওড়া।
- রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য কপাটিকা থাকে।

কৈশিক জালিকা:

- চুলের মতো সূক্ষ্ম, একস্তরীয় কোষপ্রাচীর বিশিষ্ট রক্তনালি যা টিস্যুতে জালক তৈরি করে।
- ক্ষুদ্রতম ধমনি (Arteriole) ও ক্ষুদ্রতম শিরার (Venule) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।
- এর পাতলা প্রাচীরের মাধ্যমে রক্ত ও কোষের মধ্যে গ্যাস (O_2, CO_2), পুষ্টি ও বর্জ্যের আদান-প্রদান (ব্যাপন) ঘটে।

পার্থক্য (ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা):

বৈশিষ্ট্য	ধমনি (Artery)	শিরা (Vein)	কৈশিক জালিকা (Capillary)
প্রবাহের দিক	হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে	হৃৎপিণ্ডের দিকে	ধমনি ও শিরার মধ্যে (টিস্যুতে)
রক্তের প্রকৃতি (সাধারণ)	অক্সিজেন যুক্ত (O_2) (ব্যতিক্রম: ফুসফুসীয়)	অক্সিজেন বিহীন (CO_2) (ব্যতিক্রম: ফুসফুসীয়)	মিশ্রিত (আদান-প্রদানকালে)
প্রাচীরের পুরুত্ব	পুরু	পাতলা	অত্যন্ত পাতলা (এক কোষস্তর)
পেশি/স্থিতি স্থাপকতা	বেশি	কম	অনুপস্থিত
গহ্বর (Lumen)	সরু	চওড়া	অত্যন্ত সরু (মাইক্রোস্কোপিক)
কপাটিকা (Valve)	অনুপস্থিত (প্রায়)	উপস্থিত (বিশেষত নিম্নাঙ্গে)	অনুপস্থিত
রক্তচাপ	উচ্চ	নিম্ন	নিম্ন (পরিবর্তনশীল)
প্রধান কাজ	দ্রুত রক্ত পরিবহন	রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফেরত আনা	রক্ত ও কোষের মধ্যে বস্তুর বিনিময়

রক্তচাপ

রক্তনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্ত তার প্রাচীরগায়ে যে পার্শ্বীয় চাপ প্রয়োগ করে, তাকে রক্তচাপ বলে। সাধারণত 'রক্তচাপ' বলতে ধমনির রক্তচাপকেই বোঝানো হয়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের সাথে সাথে এই চাপ পরিবর্তিত হয়।



বিস্তারিত বর্ণনা:

হৃৎপিণ্ড যখন রক্ত পাম্প করে ধমনিতে পাঠায়, তখন ধমনি প্রাচীরে চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপ দুটি ভিন্ন অবস্থায় পরিমাপ করা হয়:

১. সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure):

- হৃৎপিণ্ডের নিলয় দুটি যখন সংকুচিত হয় (অর্থাৎ সিস্টোল অবস্থায়), তখন সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে রক্তকে ধমনিতে নিক্ষেপ করে। এই সময় ধমনির ভেতরে রক্তের চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে। এই সর্বোচ্চ চাপকে সিস্টোলিক চাপ বা সংকোচন চাপ বলে।
- এটি রক্তচাপের দুটি মানের মধ্যে উপরের বা উচ্চতর মান।
- চিকিৎসকদের মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক বা আদর্শ সিস্টোলিক চাপ সাধারণত ১২০ মিলিমিটার পারদ চাপের (mmHg) নিচে থাকা উচিত।

২. ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure):

- হৃৎপিণ্ডের নিলয় দুটি যখন প্রসারিত বা শিথিল হয় (অর্থাৎ ডায়াস্টোল অবস্থায়) এবং অলিন্দ থেকে রক্ত গ্রহণ করে, তখন ধমনির ভেতরের চাপ সবচেয়ে কমে যায়। এই সর্বনিম্ন চাপকে ডায়াস্টোলিক চাপ বা প্রসারণ চাপ বলে।
- এটি রক্তচাপের দুটি মানের মধ্যে নিচের বা নিম্নতর মান।
- একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক বা আদর্শ ডায়াস্টোলিক চাপ সাধারণত ৮০ মিলিমিটার পারদ চাপের (mmHg) নিচে থাকা উচিত।

আদর্শ রক্তচাপ (Ideal Blood Pressure):

পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক বা আদর্শ রক্তচাপ হিসেবে সাধারণত ১২০/৮০ mmHg মানকে ধরা হয়। এখানে উপরের সংখ্যাটি (১২০) হলো সিস্টোলিক চাপ এবং নিচের সংখ্যাটি (৮০) হলো ডায়াস্টোলিক চাপ। তবে বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থাভেদে এই মানের কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

নাড়িচাপ (Pulse Pressure):

সিস্টোলিক চাপ এবং ডায়াস্টোলিক চাপের পার্থক্যকে নাড়িচাপ বা পালস প্রেসার বলে।

নাড়িচাপ = সিস্টোলিক চাপ - ডায়াস্টোলিক চাপ

উদাহরণস্বরূপ, যদি রক্তচাপ ১২০/৮০ mmHg হয়, তবে নাড়িচাপ হবে $(120 - 80) = 80$ mmHg।

নাড়িষ্পন্দন বা পালস (Pulse):

হৃৎপিণ্ডের সিস্টোলের সময় সৃষ্ট উচ্চ চাপের ঢেউ ধমনির স্থিতিস্থাপক প্রাচীরের মাধ্যমে বাহিত হয়, যা ধমনিগাত্রের ছন্দোময় প্রসারণ ও সংকোচন ঘটায়। এই ছন্দোময় প্রসারণ ও সংকোচনকে নাড়িষ্পন্দন বা পালস বলে। এটি সাধারণত হাতের কবজিতে হালকা চাপ দিয়ে অনুভব করা যায় (চিত্র ৬.১৭ দ্রষ্টব্য)। সুস্থ অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পালস রেট প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার হতে পারে।

রক্তচাপ পরিমাপ:

যে যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ পরিমাপ করা হয়, তাকে স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) বলে। এই যন্ত্র এবং একটি স্টেথোস্কোপের সাহায্যে সাধারণত বাহুর ধমনিতে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপ নির্ণয় করা হয়।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- রক্তনালির প্রাচীরে রক্তের চাপকে রক্তচাপ বলে (সাধারণত ধমনির চাপ)।
- **সিস্টোলিক চাপ:** হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের সময় ধমনিতে সৃষ্ট সর্বোচ্চ চাপ (আদর্শ মান < 120 mmHg)।
- **ডায়াস্টোলিক চাপ:** হৃৎপিণ্ডের প্রসারণের সময় ধমনিতে বিদ্যমান সর্বনিম্ন চাপ (আদর্শ মান < 80 mmHg)।
- পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের আদর্শ রক্তচাপ প্রায় ১২০/৮০ mmHg।
- **নাড়িচাপ:** সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপের পার্থক্য।
- রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার।
- হৃৎস্পন্দনের কারণে ধমনিতে যে ছন্দোময় স্ফীতি ও সংকোচন অনুভূত হয়, তাই নাড়িষ্পন্দন বা পালস (স্বাভাবিক হার ৬০-১০০/মিনিট)।

পার্থক্য (সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক চাপ):

বৈশিষ্ট্য	সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure)	ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure)
সংজ্ঞা	নিলয়ের সংকোচনের সময় সর্বোচ্চ ধমনীচাপ।	নিলয়ের প্রসারণের সময় সর্বনিম্ন ধমনীচাপ।
হৃৎপিণ্ডের পর্যায়	সিস্টোল (সংকোচন)	ডায়াস্টোল (প্রসারণ)
মানের প্রকৃতি	উচ্চতর মান	নিম্নতর মান
আদর্শ মান (প্রাপ্তবয়স্ক)	< ১২০ mmHg	< ৮০ mmHg
প্রকাশ	উপরের সংখ্যা (যেমন: ১২০/৮০ এর ১২০)	নিচের সংখ্যা (যেমন: ১২০/৮০ এর ৮০)

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন

রক্তচাপ হলো রক্তনালির প্রাচীরে রক্তের প্রযুক্ত চাপ। যদি এই চাপ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে স্থায়ীভাবে বেশি থাকে, তবে সেই অবস্থাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী, যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সিস্টোলিক রক্তচাপ সব সময় ১৪০ মিলিমিটার পারদ চাপ (mmHg) বা তার বেশি এবং/অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ সব সময় ৯০ mmHg বা তার বেশি থাকে, তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত বলে ধরা হয়। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অবস্থা এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান ঝুঁকি। একে অনেক সময় 'নীরব ঘাতক' (Silent Killer) বলা হয় কারণ প্রায়শই এর কোনো প্রাথমিক লক্ষণ থাকে না।

বিস্তারিত বর্ণনা:

উচ্চ রক্তচাপ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, এটি

করোনারি ধমনির রোগ (হৃদরোগ) ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ।

উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকির কারণ (Causes/Risk Factors):

নির্দিষ্ট কোনো কারণ অনেক সময় জানা না গেলেও, কিছু বিষয় উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এগুলো হলো:

- **বয়স:** বয়স বাড়ার সাথে সাথে (বিশেষত চল্লিশোর্ধ্ব) উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে।
- **বংশগতি:** পরিবারে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকলে অন্যদেরও হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- **অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা:** দেহের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বেড়ে গেলে।
- **শারীরিক পরিশ্রমের অভাব:** অলস জীবনযাপন বা ব্যায়াম না করা।
- **খাদ্যাভ্যাস:** খাবারে অতিরিক্ত লবণ (সোডিয়াম) বা চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করা।
- **ধূমপান ও মদ্যপান:** (যদিও টেক্সটে সরাসরি নেই, তবে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি)।
- **মানসিক চাপ:** অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ (Tension) বা উত্তেজনা।
- **অন্যান্য রোগ:** ডায়াবেটিস, রক্তে কোলেস্টেরলের উচ্চ মাত্রা ইত্যাদি রোগ থাকলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে।
- **গর্ভাবস্থা:** কিছু মহিলার গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিতে পারে, যা একল্যাম্পসিয়া (Eclampsia) নামক মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ (Symptoms):

উচ্চ রক্তচাপকে 'নীরব ঘাতক' বলার প্রধান কারণ হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে (প্রায় ৫০%) এর কোনো প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রোগীরা বুঝতেই পারেন না যে তারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে, যদিও এগুলো অন্য কারণেও হতে পারে:

- মাথাব্যথা (বিশেষ করে ঘাড়ের পেছনের দিকে)।
- মাথা ঘোরা।
- বুক ধড়ফড় করা।
- দুর্বল বোধ করা।

- অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠা বা শ্বাসকষ্ট।
- চোখে ঝাপসা দেখা।

অনেক সময় কোনো লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ করে হৃদরোগ বা স্ট্রোকের মতো মারাত্মক জটিলতা দেখা দেয়, যা উচ্চ রক্তচাপেরই পরিণতি।

উচ্চ রক্তচাপ নির্ণয় (Diagnosis):

যেহেতু লক্ষণ দেখে উচ্চ রক্তচাপ বোঝা কঠিন, তাই এটি নির্ণয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় হলো নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা।

- **যন্ত্র:** স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ মাপা হয়।
- **পদ্ধতি:** রক্তচাপ মাপার আগে ব্যক্তিকে কমপক্ষে ৫-১০ মিনিট শান্ত পরিবেশে স্থির হয়ে বসে বা শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে বা উত্তেজনাবশত রক্তচাপ মাপলে তা সঠিক রিডিং নাও দিতে পারে। একবারের মাপা রক্তচাপের ভিত্তিতে উচ্চ রক্তচাপ নির্ণয় করা উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন দিনে, কমপক্ষে ২০ মিনিটের ব্যবধানে কয়েকবার রক্তচাপ মেপে যদি প্রতিবারই রিডিং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পাওয়া যায়, তবেই উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- ধমনিতে রক্তের চাপ স্থায়ীভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে (সাধারণত $\geq 180/90$ mmHg)।
- এটি হৃদরোগ ও স্ট্রোকের প্রধান ঝুঁকি এবং প্রায়শই লক্ষণবিহীন হওয়ায় একে 'নীরব ঘাতক' বলে।
- ঝুঁকি বাড়ায়: বয়স, বংশগতি, স্থূলতা, অলসতা, অতিরিক্ত লবণ/চর্বি, মানসিক চাপ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, গর্ভাবস্থা (একলাম্পসিয়া)।
- লক্ষণ: প্রায়শই থাকে না। তবে মাথাব্যথা (ঘাড়ে), মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়, দুর্বলতা, চোখে ঝাপসা দেখা ইত্যাদি হতে পারে।
- অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদরোগ বা স্ট্রোক হতে পারে।

- স্ফিগমোম্যানোমিটার দিয়ে, বিশ্রামের অবস্থায়, একাধিকবার মেপে উচ্চ রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।

পার্থক্য (স্বাভাবিক রক্তচাপ ও উচ্চ রক্তচাপ):

বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক রক্তচাপ (Normal BP)	উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)
সিস্টোলিক চাপ	< 120 mmHg	≥ 180 mmHg (স্থায়ীভাবে)
ডায়াস্টোলিক চাপ	< 80 mmHg	≥ 90 mmHg (স্থায়ীভাবে)
অবস্থা	স্বাস্থ্যকর/আদর্শ	একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ, চিকিৎসার প্রয়োজন।
ঝুঁকি	হৃদরোগের ঝুঁকি কম।	হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি রোগের ঝুঁকি অনেক বেশি।

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি। সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এর থেকে উদ্ধৃত মারাত্মক জটিলতা, যেমন - হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি সমস্যা ইত্যাদি অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বিস্তারিত বর্ণনা:

উচ্চ রক্তচাপ প্রতিকার বা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত:

১. খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন:

- **ফল ও শাকসবজি:** প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে টাটকা ফল এবং শাকসবজি রাখা উচিত। এগুলো পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- **চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার:** সম্পৃক্ত চর্বি (Saturated fat) ও ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার, যেমন - ফাস্ট ফুড, ভাজাপোড়া,

লাল মাংস (গরু, খাসি), ডালডা, মাখন ইত্যাদি এড়িয়ে চলা বা কম খাওয়া উচিত।

- **লবণ (সোডিয়াম) নিয়ন্ত্রণ:** খাবারে লবণের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। পাতে বাড়তি লবণ বা কাঁচা লবণ খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত। প্যাকেটজাত বা প্রক্রিয়াজাত খাবার (যেমন: চিপস, চানাচুর, সস, লবণাক্ত বিস্কুট) যাতে প্রচুর লবণ থাকে, তা পরিহার করতে হবে।

২. ওজন নিয়ন্ত্রণ:

- যাদের ওজন বেশি বা যারা স্থূলতায় ভুগছেন, তাদের অবশ্যই ওজন কমানোর চেষ্টা করতে হবে। ওজন কমলে রক্তচাপও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়।

৩. নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম:

- প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো বা অন্য কোনো মাঝারি মানের ব্যায়াম (Aerobic exercise) করা উচিত। নিয়মিত ব্যায়াম হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখে, ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং রক্তচাপ কমাতে সহায়ক।

৪. ধূমপান বর্জন:

- ধূমপান রক্তনালির মারাত্মক ক্ষতি করে এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। তাই উচ্চ রক্তচাপ থাকলে বা এটি প্রতিরোধ করতে চাইলে ধূমপান অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

৫. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ:

- অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা রক্তচাপ বাড়াতে পারে। তাই নিয়মিত বিশ্রাম, পর্যাপ্ত ঘুম, শখের চর্চা, যোগব্যায়াম বা মেডিটেশনের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা উচিত।

৬. ঔষধ সেবন (প্রয়োজনে):

- যদি জীবনযাত্রা পরিবর্তনের মাধ্যমেও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না আসে অথবা রক্তচাপ খুব বেশি থাকে, তবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ সেবন করা অপরিহার্য।

- ডাক্তার যে ঔষধ এবং যে মাত্রায় সেবন করতে বলবেন, তা নিয়মিত ও সময়মতো খেতে হবে। নিজের ইচ্ছামতো ঔষধ বন্ধ করা বা মাত্রা পরিবর্তন করা উচিত নয়।

অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি:

মনে রাখতে হবে, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (Cerebral hemorrhage) ঘটতে পারে, যা স্ট্রোক (Stroke) নামে পরিচিত এবং এতে রোগীর মৃত্যু বা স্থায়ী পঙ্গুত্ব হতে পারে। এছাড়াও হৃদরোগ (Heart attack, Heart failure), কিডনি বিকল (Kidney failure) এবং চোখের সমস্যা (দৃষ্টিশক্তি হ্রাস) হতে পারে।

উপসংহার:

সঠিক জীবনযাপন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এর ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও প্রয়োজনে ঔষধ সেবন জরুরি।
 - **প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ:**
 1. প্রচুর টাটকা ফল ও শাকসবজি খাওয়া।
 2. চর্বিজাতীয় খাবার কম খাওয়া।
 3. খাবারে লবণ (বিশেষত কাঁচা লবণ) পরিহার করা বা কমানো।
 4. অতিরিক্ত ওজন কমানো ও স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা।
 5. নিয়মিত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা।
 6. ধূমপান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা।
 7. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
 8. ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ সেবন বা বন্ধ না করা।
- এই নিয়মগুলো মেনে চললে উচ্চ রক্তচাপ এড়ানো বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং স্ট্রোকের মতো মারাত্মক জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কোলেস্টেরল ও অন্যান্য রক্তবাহিত লিপিড

- **কোলেস্টেরল (Cholesterol):** কোলেস্টেরল হলো কোলেস্টেন (Cholestane) নামক হাইড্রোকার্বন থেকে উৎপন্ন এক ধরনের স্নেহ বা লিপিড জাতীয় পদার্থ। এটি উচ্চশ্রেণির প্রাণিজ কোষের (বিশেষ করে কোষ পর্দার) একটি অপরিহার্য গাঠনিক উপাদান। রক্তে এটি সরাসরি দ্রবীভূত হতে পারে না, তাই লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein) নামক কণার মাধ্যমে বাহিত হয়।
- **লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein):** স্নেহ পদার্থ (লিপিড) ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ, যা রক্তে কোলেস্টেরল ও অন্যান্য লিপিড পরিবহনের বাহন হিসেবে কাজ করে। প্রধান দুটি লিপোপ্রোটিন হলো LDL ও HDL।
- **ট্রাই-গ্লিসারাইড (Triglyceride):** এটিও এক প্রকার স্নেহ পদার্থ যা রক্তরসে পাওয়া যায় এবং দেহের শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে বা মেদ টিস্যুতে (Adipose tissue) জমা থাকে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

রক্তে বিভিন্ন প্রকার স্নেহ পদার্থ বা লিপিড পরিবাহিত হয়, যার মধ্যে কোলেস্টেরল, LDL, HDL এবং ট্রাই-গ্লিসারাইড অন্যতম। এদের মাত্রা স্বাস্থ্য, বিশেষ করে হৃদরোগের ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত।

(ক) LDL (Low Density Lipoprotein - নিম্ন ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন):

- **পরিচয়:** একে সাধারণত "খারাপ কোলেস্টেরল" (Bad Cholesterol) বলা হয়।
- **কাজ ও প্রভাব:** LDL রক্তশ্রোতের মাধ্যমে কোলেস্টেরলকে দেহের বিভিন্ন কোষে বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু রক্তে এর মাত্রা বেশি হয়ে গেলে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ধমনির ভেতরের প্রাচীরে জমা হতে শুরু করে এবং প্লাক (Plaque) বা চর্বি স্তর তৈরি করে। এই প্লাক ধমনিকে সরু ও শক্ত করে ফেলে (Atherosclerosis), ফলে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়।

- **পরিমাণ:** সাধারণত আমাদের রক্তের মোট কোলেস্টেরলের প্রায় ৭০% LDL রূপে থাকে।

- **আদর্শ মাত্রা:** রক্তে LDL-এর মাত্রা < 1.৮ মিলিমোল/লিটার (mmol/L) থাকা ভালো।

(খ) HDL (High Density Lipoprotein - উচ্চ ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন):

- **পরিচয়:** একে সাধারণত "ভালো কোলেস্টেরল" (Good Cholesterol) বলা হয়।
- **কাজ ও প্রভাব:** HDL রক্তনালি ও বিভিন্ন টিস্যু থেকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল সংগ্রহ করে পুনরায় যকৃতে (Liver) ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যকৃতে এই কোলেস্টেরল বিপাকিত হয় বা পিত্তরসের মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। এভাবে HDL ধমনিতে প্লাক জমাতে বাধা দেয় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।
- **আদর্শ মাত্রা:** রক্তে HDL-এর মাত্রা > 1.৫ মিলিমোল/লিটার (mmol/L) থাকা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

(গ) ট্রাই-গ্লিসারাইড (Triglyceride):

- **পরিচয়:** এটি রক্তের আরেক প্রকার চর্বি, যা প্রধানত খাদ্য থেকে প্রাপ্ত শর্করা ও স্নেহ পদার্থ থেকে যকৃতে তৈরি হয় এবং রক্তরসের মাধ্যমে বাহিত হয়। দেহের অতিরিক্ত শক্তি ট্রাই-গ্লিসারাইড হিসেবে মেদ কোষে জমা থাকে।
- **আদর্শ মাত্রা:** রক্তে খালি পেটে ট্রাই-গ্লিসারাইডের মাত্রা < 1.৭ মিলিমোল/লিটার (mmol/L) থাকা উচিত। উচ্চ মাত্রার ট্রাই-গ্লিসারাইডও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, বিশেষ করে যদি LDL বেশি বা HDL কম থাকে।

কোলেস্টেরলের উৎস:

দেহের যকৃতে কোলেস্টেরল তৈরি হয়, এছাড়াও কিছু খাবার থেকে আমরা কোলেস্টেরল পাই। উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত খাবারগুলো হলো: প্রাণীর মস্তিষ্ক, যকৃত (কলিজা), বৃক্ক, বিভিন্ন ধরনের মাছের ডিম, চিংড়ি, বিনুক, ডিম (বিশেষ করে ডিমের কুসুম), লাল মাংস (গরু, খাসি), মাখন, ঘি, চর্বি ইত্যাদি।

রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা:

- রক্তে কোলেস্টেরল (বিশেষ করে LDL) এবং ট্রাই-গ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে তা হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব রক্ত সরবরাহকারী ধমনি অর্থাৎ করোনারি ধমনির (Coronary artery) ভেতরের প্রাচীরে জমতে শুরু করে।
- এই জমে থাকা চর্বি বা প্লাক ধীরে ধীরে ধমনির গহ্বরকে সরু করে ফেলে, ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশিতে রক্ত চলাচল কমে যায়।
- যখন হৃৎপেশি পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি পায় না, বিশেষ করে পরিশ্রমের সময়, তখন বুকে এক ধরনের চাপ বা ব্যথা অনুভূত হয়। এই অবস্থাকে অ্যানজাইনা (Angina) বলে।
- ধমনির পথ যদি অতিরিক্ত সরু হয়ে যায় বা হঠাৎ করে প্লাক ফেটে গিয়ে রক্ত জমাট বেঁধে যায়, তবে হৃৎপেশিতে রক্ত সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে হার্ট অ্যাটাক (Heart attack) হয়।
- এক কথায়, রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরল করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- কোলেস্টেরল কোষের জন্য জরুরি এক প্রকার স্নেহ পদার্থ, যা রক্তে লিপোপ্রোটিন (LDL, HDL) রূপে বাহিত হয়।
- ট্রাই-গ্লিসারাইড হলো রক্তে বাহিত আরেক প্রকার চর্বি।
- LDL ("খারাপ কোলেস্টেরল"): মাত্রা বেশি হলে ধমনিতে প্লাক জমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় (আদর্শ মাত্রা < 1.6 mmol/L)।
- HDL ("ভালো কোলেস্টেরল"): অতিরিক্ত কোলেস্টেরল সরিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়ে (আদর্শ মাত্রা > 1.5 mmol/L)।
- ট্রাই-গ প্রক্রিয়াধীন): মাত্রা বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে (আদর্শ মাত্রা < 1.9 mmol/L)।
- উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার: প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (কলিজা, মগজ), ডিমের কুসুম, চিংড়ি, চর্বিযুক্ত মাংস, মাখন, ঘি।

- অতিরিক্ত কোলেস্টেরল করোনারি ধমনি সরু করে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল কমায়ে।
- এর ফলে বুকে ব্যথা (অ্যানজাইনা) এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে।

পার্থক্য (LDL ও HDL কোলেস্টেরল):

বৈশিষ্ট্য	LDL (নিম্ন ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন)	HDL (উচ্চ ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন)
প্রচলিত নাম	খারাপ কোলেস্টেরল (Bad Cholesterol)	ভালো কোলেস্টেরল (Good Cholesterol)
প্রধান কাজ	কোলেস্টেরল যকৃৎ থেকে টিস্যু/ধমনিতে বহন করে।	অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ধমনি/টিস্যু থেকে যকৃতে বহন করে।
হৃদরোগের উপর প্রভাব	মাত্রা বেশি হলে ঝুঁকি বাড়ায়।	মাত্রা বেশি হলে ঝুঁকি কমায়ে।
আদর্শ মাত্রা	কম (< 1.6 mmol/L)	বেশি (> 1.5 mmol/L)

কোলেস্টেরলের উপকারিতা ও অপকারিতা

কোলেস্টেরল একটি স্নেহজাতীয় পদার্থ যা প্রায়শই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচিত হলেও, এটি আসলে মানবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। এর যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকারী ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রক্তে এর মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি, বিশেষ করে হৃদরোগ ও পিত্তপাথরের কারণ হতে পারে।

বিস্তারিত বর্ণনা:**কোলেস্টেরলের উপকারিতা (Benefits):**

১. কোষ প্রাচীর (Cell Membrane) গঠন ও রক্ষা:
কোলেস্টেরল প্রাণিজ কোষের কোষঝিল্লি বা কোষ পর্দার (Cell membrane - এখানে 'কোষপ্রাচীর' শব্দটি কোষ পর্দা

অর্থে ব্যবহৃত) একটি অত্যাবশ্যকীয় গাঠনিক উপাদান। এটি কোষ পর্দার ভেদ্যতা (Permeability) নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ কোন পদার্থ কোষে প্রবেশ করবে বা কোষ থেকে বের হবে তা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং কোষের স্বাভাবিক গঠন বজায় রাখে।

২. হরমোন তৈরি: এটি বিভিন্ন স্টেরয়েড হরমোন (Steroid hormones) তৈরির কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে। মানবদেহের জনন হরমোন (যেমন: ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন) এবং অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত কর্টিসোল, অ্যালডোস্টেরন ইত্যাদি হরমোন কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয়।

৩. পিত্তরস (Bile) তৈরি: যকৃৎ কোলেস্টেরল ব্যবহার করে পিত্তরস বা পিত্ত অ্যাসিড (Bile acid) তৈরি করে। এই পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে, বিশেষ করে স্নেহ জাতীয় খাদ্য হজম ও শোষণে, সহায়তা করে।

৪. ভিটামিন ডি (Vitamin D) তৈরি: আমাদের ত্বকের নিচে থাকা কোলেস্টেরল সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন ডি-তে রূপান্তরিত হয়। এই ভিটামিন ডি প্রথমে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে কিডনিতে যায় এবং সেখানে কার্যকর ভিটামিন ডি-তে পরিণত হয়ে ক্যালসিয়াম শোষণ এবং হাড়ের গঠন ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন বিপাক: কোলেস্টেরল স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিন এ (A), ডি (D), ই (E) এবং কে (K)-এর বিপাকে সহায়তা করে।

৬. স্নায়ুকোষের কার্যকারিতা: স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতার জন্য, বিশেষ করে স্নায়ুকোষের আবরণী মায়েলিন সিথ (Myelin sheath) গঠনের জন্য কোলেস্টেরল অপরিহার্য।

৭. রোগ প্রতিরোধ: দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কিছু কাজের সাথেও কোলেস্টেরল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

কোলেস্টেরলের অপকারিতা (Harms):

১. হৃদরোগ ও রক্ত সংবহনতন্ত্রের সমস্যা: রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা, বিশেষ করে খারাপ কোলেস্টেরল বা LDL (Low-Density Lipoprotein) এর মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তা ধমনির (বিশেষ করে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনি) ভেতরের গায়ে জমতে শুরু করে। এর ফলে ধমনিগায়ে

চর্বি প্রলেপ বা প্লাক (Plaque) তৈরি হয়, ধমনি সরু ও শক্ত হয়ে যায় (Atherosclerosis)। এতে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়, হৃৎপেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ হয় না, যার ফলস্বরূপ বুকে ব্যথা (Angina), হার্ট অ্যাটাক এবং অন্যান্য হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যায়।

২. পিত্তপাথর (Gallstone) গঠন: পিত্তরস যকৃৎ থেকে কোলেস্টেরলসহ অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে অপসারণে সাহায্য করে। কিন্তু পিত্তরসে যদি কোলেস্টেরলের মাত্রা পিত্ত অ্যাসিড ও অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন অতিরিক্ত কোলেস্টেরল জমতে শুরু করে এবং ক্রিস্টাল বা স্ফটিকে পরিণত হয়। এই কোলেস্টেরলের দানাগুলোই শক্ত হয়ে পিত্তথলির (Gallbladder) ভেতরে পাথর তৈরি করে, যা পিত্তপাথর (Gallstone) নামে পরিচিত। কোলেস্টেরল ছাড়াও পিত্তরসের অন্যান্য উপাদান যেমন বিলিরুবিন, ফসফেট, ক্যালসিয়াম লবণ ইত্যাদি জমেও পিত্তপাথর হতে পারে।

উপসংহার:

কোলেস্টেরল একদিকে যেমন দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, অন্যদিকে এর অতিরিক্ত মাত্রা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ। তাই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সুস্বাদু খাদ্যভ্যাসের মাধ্যমে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত জরুরি।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- কোলেস্টেরল দেহের জন্য উপকারী ও অপকারী উভয় ভূমিকাই পালন করে।
- উপকারিতা:** কোষ পর্দা গঠন ও ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রণ; স্টেরয়েড হরমোন (জনন ও অ্যাড্রেনাল) তৈরি; পিত্তরস তৈরি; ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ; স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E, K) বিপাকে সহায়তা; স্নায়ুকোষ ও রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা।
- অপকারিতা:** রক্তে অতিরিক্ত LDL কোলেস্টেরল ধমনিতে প্লাক জমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়; পিত্তরসে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল পিত্তথলিতে পাথর তৈরি করতে পারে।
- সুস্থ থাকার জন্য রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

পার্থক্য (কোলেস্টেরলের দ্বিমুখী ভূমিকা):

দিক	উপকারী ভূমিকা (Benefit)	অপকারী ভূমিকা (Harm)
কোষ পর্দা	অত্যাবশ্যকীয় গাঠনিক উপাদান, ভেদ্যতা নিয়ন্ত্রণ।	-
হরমোন	স্টেরয়েড হরমোন তৈরির কাঁচামাল।	-
পিত্তরস	পিত্ত অ্যাসিড তৈরিতে ব্যবহৃত হয় (পরিপাকের জন্য জরুরি)।	পিত্তরসে অতিরিক্ত হলে পিত্তপাথর তৈরি করতে পারে।
ভিটামিন ডি	ত্বকে সূর্যালোকের সাহায্যে ভিটামিন ডি তৈরি করে।	-
হৃদস্বাস্থ্য	-	রক্তে মাত্রাতিরিক্ত হলে (LDL) অ্যাথেরোস্কেলেরো সিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

লিউকেমিয়া (রক্তের ক্যান্সার)

অস্থিমজ্জা ও রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা: লিউকেমিয়া (Leukemia)

লিউকেমিয়া (Leukemia) হলো রক্ত বা অস্থিমজ্জার ক্যান্সার। এটি এমন একটি রোগ যেখানে অস্থিমজ্জা থেকে অস্বাভাবিক শ্বেত রক্তকণিকার (White Blood Cells - WBCs) উৎপাদন অত্যধিক হারে বেড়ে যায়। এই অস্বাভাবিক শ্বেত রক্তকণিকাগুলো অপরিণত ও ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় এরা সঠিকভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না। উপরন্তু, এদের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি স্বাভাবিক লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Cells - RBCs) ও অণুচক্রিকার (Platelets) উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে, যার ফলে বিভিন্ন মারাত্মক লক্ষণ দেখা দেয়।

বিস্তারিত বর্ণনা:

আমাদের দেহের অস্থিমজ্জার (Bone Marrow) মূল কোষ বা স্টেম সেল (Stem cell) থেকে বিভিন্ন রক্তকণিকা (লোহিত, শ্বেত, অণুচক্রিকা) তৈরি হয়। লিউকেমিয়া হলে এই রক্ত সৃষ্টিকারী কোষগুলোতে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, যার ফলে প্রধানত শ্বেত রক্তকণিকার উৎপাদন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

- **রোগের প্রকৃতি:** লিউকেমিয়াকে রক্তের ক্যান্সার বলা হয়। এতে অস্থিমজ্জা প্রচুর পরিমাণে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি করলেও সেগুলো হয় অপরিণত অথবা অস্বাভাবিক। ফলে, রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক বেশি দেখা গেলেও তারা আসলে ক্যান্সার কোষে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ("কাজির কোষে শ্বেতকণার স্বল্পতায়, রোগ প্রতিরোধে অক্ষম")।
- **অন্যান্য রক্তকণিকার উপর প্রভাব:** অস্থিমজ্জায় অস্বাভাবিক শ্বেত কণিকার অত্যধিক উৎপাদনের কারণে স্বাভাবিক লোহিত কণিকা ও অণুচক্রিকা তৈরির জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও উপাদান থাকে না। ফলে এদের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যায়।
- **লিউকেমিয়ার লক্ষণ:** লিউকেমিয়ার লক্ষণগুলো মূলত স্বাভাবিক রক্তকণিকার অভাবের কারণেই দেখা দেয়:

1. **লোহিত কণিকার স্বল্পতা (Anemia):** রোগী দুর্বল বোধ করে, খুব সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চেহারা ফ্যাকাশে দেখায়, শ্বাসকষ্ট হতে পারে (অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য)।
2. **অণুচক্রিকার স্বল্পতা:** রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে দাঁতের গোড়া, নাক বা শরীরের যেকোনো স্থান থেকে কোনো আঘাত ছাড়াই হঠাৎ রক্তক্ষরণ হতে পারে। ত্বকের নিচে ছোট ছোট লাল দাগ (Petechiae) বা কালশিটে দাগ (Bruise) দেখা দিতে পারে ("পায়ের পিঠে কালচে রঙের মতো ফুলো ফুলো দাগ")।
3. **অকার্যকর শ্বেত কণিকা:** রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ঘন ঘন জ্বর বা বিভিন্ন সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।
4. **অন্যান্য লক্ষণ:** লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, হাড় বা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী

বিভিন্ন প্রকারের লিউকেমিয়া আছে এবং প্রকারভেদ অনুযায়ী লক্ষণের তারতম্য হতে পারে।

- **চিকিৎসা:** লিউকেমিয়ার চিকিৎসা নির্ভর করে রোগের প্রকারভেদ, রোগীর বয়স ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর। চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা এবং অস্থিমজ্জায় স্বাভাবিক রক্ত কোষ উৎপাদন ফিরিয়ে আনা।

1. **কেমোথেরাপি (Chemotherapy):** এটি লিউকেমিয়ার প্রধান চিকিৎসা। এতে বিশেষ ঔষধ ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।
2. **অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplant):** কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তীব্র লিউকেমিয়ায়, রোগীর রোগাক্রান্ত অস্থিমজ্জা কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দিয়ে ধ্বংস করে দাতার সুস্থ অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি একটি জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা।
3. **অন্যান্য:** রেডিওথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি ইত্যাদিও ব্যবহৃত হতে পারে।

বর্তমানে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা গেলে এবং সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করলে লিউকেমিয়া থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। একসময় এর উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হলেও, বর্তমানে বাংলাদেশেও (যেমন: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনসহ উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু সরকারি হাসপাতালেও কেমোথেরাপির সুযোগ আছে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- লিউকেমিয়া হলো রক্ত বা অস্থিমজ্জার ক্যান্সার, যেখানে অস্বাভাবিক শ্বেত রক্তকণিকা অত্যধিক হারে উৎপন্ন হয়।
- এই অস্বাভাবিক শ্বেত কণিকাগুলো অকার্যকর এবং রোগ প্রতিরোধে অক্ষম।
- এদের অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে স্বাভাবিক লোহিত কণিকা ও অণুচক্রিকার উৎপাদন কমে যায়।
- **লক্ষণ:** ক্লান্তি, ফ্যাকাশে ভাব (অ্যানিমিয়া); সহজে রক্তক্ষরণ, কালশিটে দাগ (অণুচক্রিকার অভাব); ঘন ঘন সংক্রমণ; লসিকা গ্রন্থি ফোলা, হাড়ে ব্যথা ইত্যাদি।
- লিউকেমিয়াকে সাধারণত ব্লাড ক্যান্সার বলা হয়।

- প্রধান চিকিৎসা হলো কেমোথেরাপি এবং ক্ষেত্রবিশেষে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন।
- প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসায় আরোগ্য সম্ভব।
- বাংলাদেশে এখন লিউকেমিয়ার উন্নত চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে।

হার্ট অ্যাটাক

রক্ত সংবহনতন্ত্রের কয়েকটি রোগ ও প্রতিকার: (ক) হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack)

হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction) একটি জরুরি ও জীবন-হুমকির কারণ হতে পারে এমন একটি অবস্থা। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনিগুলোর কোনো একটিতে রক্ত চলাচল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে বা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হলে হৃৎপিণ্ডের পেশি বা মায়োকার্ডিয়ামের যে অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়, সেখানকার কোষগুলো অক্সিজেন ও পুষ্টির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মারা যায়। এই অবস্থাকেই হার্ট অ্যাটাক বলে।

বিস্তারিত বর্ণনা:

কারণ (Cause):

হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ হলো করোনারি ধমনির রোগ (Coronary Artery Disease)। এটি সাধারণত ঘটে যখন:

১. **অ্যাথেরোস্কেলরোসিস (Atherosclerosis):** করোনারি ধমনির ভেতরের দেয়ালে চর্বি, কোলেস্টেরল ও অন্যান্য পদার্থ জমে একটি শক্ত স্তর বা প্লাক (Plaque) তৈরি হয়। এর ফলে ধমনি সরু ও শক্ত হয়ে যায়।

২. **করোনারি থ্রম্বোসিস (Coronary Thrombosis):** এই প্লাকের উপর বা এর আশেপাশে যখন রক্ত জমাট বেঁধে (Thrombus) ধমনির পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়, তখন হৃৎপিণ্ডের নির্দিষ্ট অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক ঘটে।

ঝুঁকির কারণ (Risk Factors):

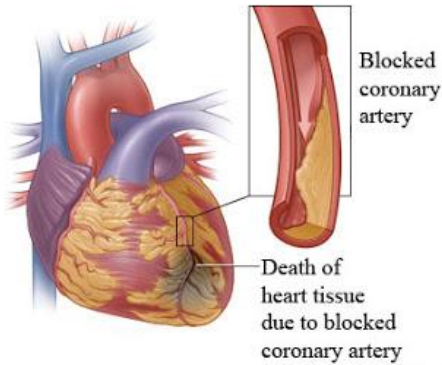
কিছু বিষয় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়:

- **বয়স:** বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঝুঁকি বাড়ে, যদিও বর্তমানে

তরুণ বয়সেও হার্ট অ্যাটাক দেখা যাচ্ছে।

- **উচ্চ রক্তচাপ:** অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ধমনির ক্ষতি করে।
- **উচ্চ কোলেস্টেরল:** রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) এর মাত্রা বেশি থাকা।
- **ডায়াবেটিস:** অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রক্তনালির ক্ষতি করে।
- **ধূমপান:** ধূমপান ধমনির প্রাচীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বাড়ায়।
- **খাদ্যাভ্যাস:** অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার (যেমন: বিরিয়ানি, তেহারি, ফাস্টফুড, ভাজাপোড়া), লবণ ও চিনিযুক্ত খাবার গ্রহণ।
- **স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন:** দেহের ওজন বেশি হলে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ বাড়ে।
- **শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা:** নিয়মিত ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম না করা, অলস জীবনযাপন।
- **মানসিক চাপ:** অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ।
- **পারিবারিক ইতিহাস:** পরিবারে কারও অল্প বয়সে হৃদরোগ থাকলে।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণসমূহ (Symptoms):



হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে, তবে সাধারণ লক্ষণগুলো হলো:

- **বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি:** এটি সবচেয়ে পরিচিত লক্ষণ। বুকের মাঝখানে তীব্র চাপ, ভারি ভাব, মোচড়ানো বা জ্বালা করার মতো অনুভূতি হতে পারে। এই ব্যথা কয়েক মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়।
- **ব্যথা ছড়িয়ে পড়া:** বুক থেকে ব্যথা কাঁধ, ঘাড়, গলা, চোয়াল, পিঠ অথবা এক বা উভয় বাহুতে (বিশেষ করে

বাম বাহুতে) ছড়িয়ে যেতে পারে।

- **শ্বাসকষ্ট:** হঠাৎ করে শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া।
- **ঘাম:** শরীর ঠান্ডা হয়ে অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া।
- **বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।**
- **মাথা ঘোরা বা ঝিমঝিম করা।**
- **অস্বাভাবিক ক্লান্তি বা দুর্বলতা।**

বিশেষ সতর্কতা: অনেক সময়, বিশেষ করে মহিলা বা ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে, বুকে তীব্র ব্যথা নাও হতে পারে বা অন্য ধরনের লক্ষণ (যেমন: শুধু শ্বাসকষ্ট বা পেটের উপরের দিকে অস্বস্তি) দেখা দিতে পারে। যেকোনো সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রতিকার ও চিকিৎসা (Prevention and Management):

- **জরুরি চিকিৎসা:** হার্ট অ্যাটাক একটি মেডিকেল ইমার্জেন্সি। লক্ষণ দেখা দিলে সময় নষ্ট না করে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে এবং ইসিজি (ECG) সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করতে হবে। যত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়, হৃৎপেশির ক্ষতি তত কম হয়।
- **জীবনযাত্রার পরিবর্তন (প্রতিরোধ ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা):**
 1. **ধূমপান বর্জন:** ধূমপান অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে।
 2. **স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস:** চর্বিযুক্ত খাবার, ফাস্টফুড, অতিরিক্ত লবণ ও চিনি পরিহার করতে হবে। প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি খেতে হবে।
 3. **নিয়মিত ব্যায়াম:** প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা অন্য কোনো ব্যায়াম করা।
 4. **ওজন নিয়ন্ত্রণ:** শরীরের ওজন আদর্শ মাত্রায় রাখতে হবে।
 5. **অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ:** উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে হবে।
 6. **মানসিক চাপ কমানো:** নিয়মিত বিশ্রাম ও মানসিক প্রশান্তির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- করোনারি ধমনিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হৃৎপেশি

ক্ষতিগ্রস্ত বা মারা গেলে তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।

- মূল কারণ ধমনিতে চর্বি জমে (অ্যাথেরোস্কেলেরোসিস) এবং রক্ত জমাট বাঁধা (থ্রম্বোসিস)।
- **ঝুঁকি:** বয়স, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাবার, স্থূলতা, ব্যায়াম না করা, মানসিক চাপ।
- **লক্ষণ:** বুকে তীব্র ব্যথা/চাপ (যা বাহু/ঘাড়/চোয়ালে ছড়াতে পারে), শ্বাসকষ্ট, ঘাম, বমি ভাব, মাথা ঘোরা। লক্ষণ ভিন্নও হতে পারে।
- হার্ট অ্যাটাক একটি জরুরি অবস্থা; দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া অপরিহার্য।
- **প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণ:** স্বাস্থ্যকর খাবার, ব্যায়াম, ধূমপান বর্জন, ওজন নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ কমানো, অন্যান্য রোগ (উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস) নিয়ন্ত্রণ, ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা।

পার্থক্য (অ্যানজাইনা ও হার্ট অ্যাটাক):

বৈশিষ্ট্য	অ্যানজাইনা (Angina)	হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack)
কারণ	করোনারি ধমনি সরু হওয়ায় হৃৎপেশিতে সাময়িক অক্সিজেন স্বল্পতা।	করোনারি ধমনি হঠাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ।
হৃৎপেশির ক্ষতি	সাধারণত স্থায়ী ক্ষতি হয় না।	হৃৎপেশির স্থায়ী ক্ষতি বা মৃত্যু ঘটে।
ব্যথার সময়কাল	সাধারণত অল্প সময় (কয়েক মিনিট), বিশ্রাম নিলে বা ঔষধ নিলে কমে যায়।	সাধারণত দীর্ঘ সময় (২০ মিনিটের বেশি), বিশ্রাম বা সাধারণ ঔষধে সারে না।

গুরুত্ব	হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব সংকেত, গুরুতর অবস্থা।	মেডিকেল ইমার্জেন্সি, জীবনহানির আশঙ্কা।
---------	---	--

বাতজ্বর এবং হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায়

বাতজ্বর (Rheumatic Fever)

বাতজ্বর বা রিউম্যাটিক ফিভার হলো একটি প্রদাহজনিত রোগ যা 'স্ট্রেপটোকক্কাস' (Group A Streptococcus) নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে সৃষ্ট গলাদাহ (টনসিলের প্রদাহ বা গলা ব্যথা) বা ত্বকের সংক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা দিতে পারে। এটি মূলত একটি ইমিউন রিঅ্যাকশন (autoimmune reaction) যেখানে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি ভুলবশত দেহের নিজস্ব টিস্যু, বিশেষ করে হৃৎপিণ্ড, অস্থিসন্ধি, মস্তিষ্ক ও ত্বকে আক্রমণ করে। এই রোগটি সাধারণত শিশু ও কিশোর বয়সে (৫-১৫ বছর) বেশি হয়।

বিস্তারিত বর্ণনা:

- **কারণ:** স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, বিশেষ করে টনসিলের প্রদাহ বা গলা ব্যথা, যদি সময়মতো সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করা না হয়, তবে বাতজ্বর হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

লক্ষণসমূহ:

১. জ্বর।
২. অস্থিসন্ধিতে (যেমন: হাঁটু, কনুই, গোড়ালি, কবজি) ব্যথা ও ফোলা। ব্যথা সাধারণত এক সন্ধি থেকে অন্য সন্ধিতে ঘুরে বেড়ায়।
৩. শরীর দুর্বল লাগা, ক্লান্তি।
৪. ক্ষুধামন্দা, খাবারে অরুচি।
৫. ওজন হ্রাস পাওয়া।
৬. ক্ষেত্রবিশেষে ত্বকে লালচে দাগ দেখা দিতে পারে।

হৃৎপিণ্ডের উপর প্রভাব: বাতজ্বরের সবচেয়ে মারাত্মক জটিলতা হলো হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ বা কার্ডাইটিস (Carditis)।

এতে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশি, অন্তঃস্তর এবং বিশেষ করে হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা বা ভালভ (Heart valves) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভালভগুলো স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে হৃৎপিণ্ড যথাযথভাবে রক্ত পাম্প করতে পারে না এবং দেহে রক্ত প্রবাহ কমে যায়। এই অবস্থাকে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ (Rheumatic Heart Disease) বলে, যা পরবর্তীতে হার্ট ফেইলিওরের কারণ হতে পারে।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ:

- বাতজ্বর লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু নির্মূল করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন: পেনিসিলিন) এবং প্রদাহ কমানোর জন্য অ্যাসপিরিন বা অন্যান্য প্রদাহরোধী ঔষধ।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিরোধ। গলা ব্যথা বা টনসিলের প্রদাহ হলে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিকের সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করা উচিত।
- যাদের একবার বাতজ্বর হয়েছে, তাদের পুনরায় বাতজ্বর হওয়া এবং হৃৎপিণ্ডের ভালভের আরও ক্ষতি হওয়া রোধ করার জন্য অনেক চিকিৎসক দীর্ঘদিন (অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত) নিয়মিতভাবে পেনিসিলিন ইনজেকশন বা ট্যাবলেট গ্রহণের পরামর্শ দেন।

যা যা মনে রাখতে হবে:

- বাতজ্বর স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের পর সৃষ্ট একটি প্রদাহজনিত রোগ, যা মূলত শিশুদের হয়।
- লক্ষণ: জ্বর, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা ও ফোলা, দুর্বলতা, ক্ষুধামন্দা।
- এটি হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দিতে পারে (রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজ)।
- গলা ব্যথার সঠিক চিকিৎসা (অ্যান্টিবায়োটিক) বাতজ্বর প্রতিরোধ করে।
- চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন) ও প্রদাহরোধী ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

- পুনরায় আক্রমণ রোধে দীর্ঘমেয়াদী পেনিসিলিন ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।

হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখার উপায় (Ways to Keep the Heart Healthy)

ভূমিকা:

হৃৎপিণ্ড মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর একটি, যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য হৃৎপিণ্ডের যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি (Lifestyle) অনুসরণ করে হৃৎপিণ্ডকে বহুলাংশে সুস্থ রাখা সম্ভব।

বিস্তারিত বর্ণনা (হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার নিয়মাবলী):

১. সঠিক খাদ্য নির্বাচন:

- সুস্বাদু খাদ্যভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার (যেমন: ফাস্ট ফুড, ভাজাপোড়া, মাখন, ঘি, মাংসের চর্বি) পরিহার করতে হবে, কারণ এগুলো রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে ধমনিতে প্লাক জমাতে সাহায্য করে, যা হৃৎপিণ্ডের জন্য ক্ষতিকর।
- খাবারে লবণের ব্যবহার কমাতে হবে, কারণ অতিরিক্ত লবণ উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়।
- প্রচুর পরিমাণে তাজা ফলমূল ও শাকসবজি খেতে হবে। আঁশযুক্ত খাবার (যেমন: লাল আটা, টেকিছাঁটা চাল, ওটস) খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।

২. ধূমপান ও মাদক বর্জন:

- ধূমপান হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।
- যেকোনো ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এগুলো হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণ:

শরীরের ওজন আদর্শ সীমার মধ্যে রাখতে হবে। অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা হৃৎপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে

এবং উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

৪. নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম:

- প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম (যেমন: দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো) করা উচিত। ব্যায়াম হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, ওজন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৫. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ:

- অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই মেডিটেশন, শখের চর্চা, পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রামের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে।

৬. অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ:

- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরল থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রা পরিবর্তন ও নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে।

যা যা মনে রাখতে হবে:

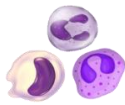
- সুস্থ জীবনের জন্য হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখা অপরিহার্য।
- সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে; অতিরিক্ত চর্বি ও লবণ পরিহার করতে হবে।
- প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম করতে হবে।
- শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- ধূমপান ও মাদকদ্রব্য বর্জন করতে হবে।
- মানসিক চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।
- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই হলো সুস্থ হৃৎপিণ্ডের চাবিকাঠি।

সৃজনশীল

প্রশ্ন ১. নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর-



চিত্র: L



চিত্র: M



চিত্র: N

[ঢা. বো. ২২]

(ক) পরিবৃদ্ধি কাকে বলে?

(খ) মেয়েরা সাধারণত সেক্স-লিংকড রোগে আক্রান্ত হয় না কেন?

(গ) চিত্র 'L' দ্বারা সৃষ্ট অঙ্গটির চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

(ঘ) উদ্ভিদকে চিত্র 'M' এর উপর চিত্র 'N' এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ২. নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর:



চিত্র: X



চিত্র: Y

[ব. বো. ২৩]

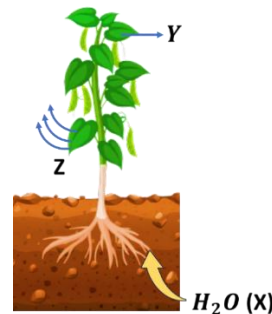
(ক) সর্বজনীন রক্তদাতা কাকে বলে?

(খ) পানিকে 'ফ্লুইড অফ লাইফ' বলা হয় কেন?

(গ) উদ্ভিদকে 'X' চিত্রটির গঠন চিহ্নিত চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'X' অঙ্গটি সুস্থ রাখতে 'Y' উপাদানগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৩. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর-



[রা. বো. ২২]

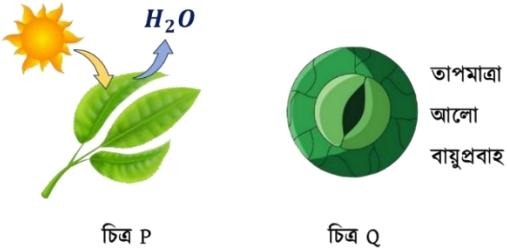
(ক) অভিস্রবণ কাকে বলে?

(খ) ঘরের এক কোণে আতর দিলে তা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে কেন?

(গ) 'X' উপাদানটি কীভাবে 'Y' অংশে পৌঁছায়? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'Z' প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের জন্য উপকারী হলেও কিছুটা ক্ষতিকর"- বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৪. নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর-



[চ. বো. ২৪]

(ক) জৈব মুদ্রা কী?

(খ) সবাত শ্বসনে O_2 এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য কেন?

(গ) উদ্ভীপকের 'P' চিত্রে শর্করা তৈরির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্ভীপকের চিত্র 'Q' এর জৈবিক কার্য সম্পাদনে উপাদানগুলোর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৫. পঞ্চাশোর্ধ হাফিজ সাহেব অসুস্থ বোধ করার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। ডাক্তার সাহেব উনার পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। পরীক্ষার রিপোর্ট নিম্নরূপ:

BP-160/135 ml

HDL -> 1.2 ml

LDL-> 3.8 ml

[চ. বো. ২৪]

(ক) কোষরস কাকে বলে?

(খ) পজিটিভ গ্রুপের রক্ত নেগেটিভ গ্রুপের ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে না কেন?

(গ) উদ্ভীপকে BP এর রিপোর্ট হাফিজ সাহেবের যে রোগকে নির্দেশ করছে তার কারণ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) HDL ও LDL এর মান হাফিজ সাহেবের জন্য কতটুকু নিরাপদ? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৬. মানব দেহের দুই ফুসফুসের মাঝখানে একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ আছে যার মাধ্যমে সারা দেহে এক ধরনের তরল পদার্থ পরিবাহিত হয়।

[সি. বো. ২৪]

(ক) রক্তরস কাকে বলে?

(খ) ধমনি এবং শিরার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।

(গ) উদ্ভীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির লব্ধিদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

(ঘ) উদ্ভীপকে উল্লিখিত তরল পদার্থটি মানব দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে-বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৭. নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর-



চিত্র: J

চিত্র: K

চিত্র: L

[দি. বো. ২৪]

(ক) পেলভিস কাকে বলে?

(খ) বৃক্ক পাথর হয় কেন?

(গ) চিত্র-'J' ও 'K' এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(ঘ) চিত্রের 'L' দ্বারা গঠিত অঙ্গের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৮. ইদানীং রফিক সাহেবের ভালো ঘুম হয় না এবং অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠেন, ঘাড়ে ব্যথা হয় ও বুক ধড়ফড় করে। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে চিকিৎসক তাকে ওজন কমানো, চর্বি জাতীয় খাবার কম খাওয়া এবং নিয়মিত ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেন।

[ঢা. বো. ২৩]

(ক) বাতজ্বর কী?

(খ) রক্তের গ্রুপ জানা প্রয়োজন কেন?

(গ) উদ্ভীপকে উল্লিখিত খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্ভীপকে রফিক সাহেবের রোগের কারণ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ৯. সড়ক দুর্ঘটনায় আহত মুরাদের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তার দেহের পাম্প যন্ত্রটির কাজে সমস্যা দেখা দেয়।

জীবন বাঁচানোর জন্য মুরাদের দুই বন্ধু তুহিন ও শাফিন তাকে রক্ত দিতে চাইলে ডাক্তার মুরাদসহ তিনজনের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে দেখলেন, মুরাদের রক্তের গ্রুপ B+, তুহিনের A+ এবং শাফিনের O+।

[রা. বো. ২৩]

(ক) আপেক্ষিক আর্দ্রতা কাকে বলে?

(খ) কোষপ্রাচীর পানি শুষে স্থায়ী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্ভীপকে উল্লিখিত অঙ্গটির গঠন বর্ণনা কর।

(ঘ) তুহিন ও শাফিন উভয়ের রক্তই কী মুরাদ গ্রহণ করতে পারবে? যুক্তিসহ মতামত বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১০. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর-



চিত্র: F

[য. বো. ২৩]

(ক) অভিস্রবণ কাকে বলে?

(খ) শুকনো কাঠ পানিতে ডুবালে সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) চিত্র 'F' এর লম্বচ্ছেদের চিত্রিত চিত্র অঙ্কন কর।

(ঘ) চিত্র 'F' অঙ্গটির সংকোচন-প্রসারণের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১১. X লোহিত রক্ত কোষের অভাবে O_2 এর ঘাটতি হয়।

$Y \rightarrow$ রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত, বৃদ্ধি পায়।

$Z \rightarrow$ শ্বাসনালির প্রদাহ, টনসিলের প্রদাহ

[কু. বো. ২৩]

(ক) হিমোগ্লোবিন কী?

(খ) শরীরে কোথাও কেটে গেলে অনেক সময় সহজেই রক্তপাত বন্ধ হয় না কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্ভীপকের 'Y' দ্বারা যে রোগটির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তার কারণ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্ভীপকের 'X' ও 'Z' রোগ দুটির মধ্যে কোনটি বেশি ভয়াবহ- যুক্তিসহ মতামত দাও।

প্রশ্ন ১২. মতিন সাহেব বৃদ্ধি অসহনীয় ব্যাথা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন যে, তার বক্ষগহ্বরের ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গটির রক্ত সঞ্চালনে এর টিস্যু ঠিকমতো কাজ করছে না। তিনি আরও বললেন, "সঠিক জীবনধারা ও খাদ্য নির্বাচন অনুসরণ করে অঙ্গটিকে সুস্থ রাখা যায়।"

[চ. বো.-২৩]

(ক) কোলেস্টেরল কী?

(খ) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন ব্যাখ্যা কর।

(গ) মতিন সাহেবের আক্রান্ত অঙ্গটির টিস্যুর গঠন বর্ণনা কর।

(ঘ) ডাক্তার সাহেবের শেষের উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন ১৩. P, Q, R তিন বন্ধু। তারা ঘুরতে বের হলে P ও Q দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়। P এর রক্তক্ষরণ দ্রুত থেমে যায় কিন্তু Q এর রক্তের প্রয়োজন হয়। তাদের রক্তের গ্রুপ নিম্নরূপ:

নাম	রক্তের গ্রুপ
P	A+
Q	B+
R	AB-

[সি. বো. ২৩]

(ক) Artery কী?

(খ) শ্বেত রক্তকণিকা কীভাবে এলার্জি প্রতিরোধ করে?

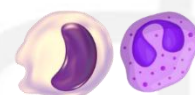
(গ) P-এর রক্তক্ষরণ থেমে যাওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) P ও R এর মধ্যে কে কে রক্ত দিতে পারবে? বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১৪. চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র: A



চিত্র: B

[দি. বো. ২৩]

(ক) Angina কী?

(খ) উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলা হয় কেন?

(গ) উদ্ভীপকের A চিত্রের X প্রক্রিয়াটিকে কেন Necessary Evil বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্ভীপকের B এর অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগটি মানবদেহে কী ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ১৫. চিত্রটি লক্ষ কর:



[ম. বো. ২৩]

(ক) ব্যাপন চাপ কাকে বলে?

(খ) চুলের মতো সূক্ষ্ম রক্তনালির ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্ভীপকের 'A' দ্বারা সংঘটিত প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

(ঘ) 'B' দ্বারা নির্দেশিত প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় হলেও কখনো কখনো ক্ষতিকর- মতামত দাও।

বহুনির্বাচনী

১। প্রোটোপ্লাজমের শতকরা কত ভাগ পানি? [চ. বো. ২৩; রা. বো. ১৫]

ক. ৬০% খ. ৭০%

গ. ৮০% ঘ. ৯০%

উত্তর: ৯০%

২। শুকনো কাঠ পানি শোষণ করে স্ফীত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত কোনটি? [দি. বো. ১৯]

ক. প্রস্বেদন খ. ব্যাপন

গ. অভিশ্রবণ ঘ. ইমবাইবিশন

উত্তর: ইমবাইবিশন

৩। নিচের কোনটি হাইড্রোফিলিক পদার্থ নয়? [ঢা. বো. ২০]

ক. সেলুলোজ

খ. কিউটিন

গ. স্টার্চ

ঘ. জিলাটি

উত্তর: কিউটিন

৪। মধুতে আঙ্গুর ডুবিয়ে রাখলে কী হবে? [রা. বো. '২২]

ক. বহিঃঅভিশ্রবণ

খ. অন্তঃঅভিশ্রবণ

গ. ইমবাইবিশন

ঘ. ব্যাপন

উত্তর: বহিঃঅভিশ্রবণ

৫। মূল দ্বারা উত্তোলিত পানির সর্বশেষ গন্তব্য কোনটি?

ক. এপিডার্মিস

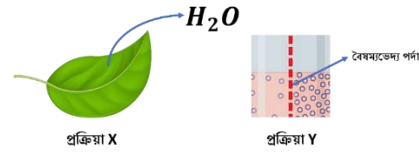
খ. সীভনল

গ. এন্ডোডার্মিস

ঘ. মেসোফিল টিস্যু

উত্তর: মেসোফিল টিস্যু

নিচের উদ্ভীপকের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৬। Y প্রক্রিয়ার মাধ্যমে-

i. পোলাও এর গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে

ii. উদ্ভিদে রস উত্তোলন ঘটে

iii. দ্রাবক হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ii ও iii

৭। উদ্ভিদে X ও Y প্রক্রিয়া দুটির ক্ষেত্রে-

i. প্রথম প্রক্রিয়াটি চোষক টান বজায় রাখে

ii. প্রথমটির অভাবে দ্বিতীয়টি কম ঘটবে

iii. উভয় প্রক্রিয়া পানি শোষণে সাহায্য করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: i, ii ও iii

নিচের উদ্ভীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

গ্রীষ্মের দুপুরে প্রান্ত স্কুল থেকে বাসায় ফিরার পথে দেখলো রাস্তার ডিভাইডার-এ কিছু গাছ লাগানো আছে। গাছগুলোর

পাতা নিস্তেজ ও প্রচুর ধূলাযুক্ত। [রা. বো. ১৯]

৮। গাছগুলোতে শর্করা তৈরির কোন উপাদানের অভাব রয়েছে?

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড খ. তাপমাত্রা
গ. পানি ঘ. ক্লোরোফিল

উত্তর: ষাটের দশক

৯। প্রান্তর দেখা জীবগুলো যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, সেই রাজ্যটি-

i. পরিবেশ ঠান্ডা রাখে
ii. ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করে
iii. মানব সভ্যতা রক্ষা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: i, ii ও iii

১০। কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদে খনিজ পদার্থ পাশের কোষে স্থানান্তরিত হয়? [দি. বো. ২০]

ক. ইমবাইবিশন খ. অভিশ্রবণ
গ. ব্যাপন ঘ. শ্বসন

উত্তর: অভিশ্রবণ

১১। কোষরস আরোহণ কীসের মাধ্যমে ঘটে? [চ. বো. ১৭]

ক. ভেসেল খ. ট্র্যাকিড
গ. সিডনল ঘ. ফ্লোয়েম ফাইবার

উত্তর: ভেসেল

১২। উদ্ভিদের প্রস্তুতকৃত খাদ্য কোন কোষের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়? [ব. বো. ১৭]

ক. ট্র্যাকিড খ. সিডনল
গ. ভেসেল ঘ. সঙ্গীকোষ

উত্তর: সিডনল

১৩। ক্যালোজ জমা হয় নিচের কোনটিতে? [চ. বো. ২২]

ক. ভেসেলে খ. সিডপ্লেট
গ. সঙ্গীকোষ ঘ. ট্র্যাকিড

উত্তর: সিডপ্লেট

১৪। কোনটির মাধ্যমে উদ্ভিদে সর্বাধিক প্রস্বেদন হয়? [চ. বো. ২৪]

ক. মূলরোম খ. পত্ররন্ধ্র
গ. কিউটিকল ঘ. লেন্টিসেল

উত্তর: পত্ররন্ধ্র

১৫। কোনটি পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে? [সি. বো. ২৪]

ক. কিউটিকল খ. বায়ুপ্রবাহ
গ. সূর্যালোক ঘ. প্যালিসেড কোষ

উত্তর: সূর্যালোক

১৬। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের কত ভাগ পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়? [সি. বো. ২০; ম. বো. ২২, ২০]

ক. ১৫-২০% খ. ৬০-৭০%
গ. ৮০-৮৫% ঘ. ৯০ - ৯৫%

উত্তর: ৯০ - ৯৫%

১৭। প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধির সাথে কোনটি সম্পর্কিত? [কু. বো. ১৯]

ক. বায়ুচাপ বৃদ্ধি
খ. নিম্ন তাপমাত্রা
গ. পাতার সংখ্যা বেশি
ঘ. পত্রফলকের আয়তন ছোট

উত্তর: পাতার সংখ্যা বেশি

১৮। প্রস্বেদনকে 'প্রয়োজনীয় ক্ষতি' নামে অভিহিত করেছেন কোন বিজ্ঞানী? [রা. বো. ১৬ : য. বো. ১৫]

ক. লিনিয়াস খ. কার্টিস
গ. লোয়ী ঘ. গ্রেগর জোহান মেন্ডেল

উত্তর: কার্টিস

১৯। কোন মৌলের উপস্থিতির জন্য রক্তের রং লাল হয়? [য. বো. ১৯]

ক. ক্যালসিয়াম খ. ম্যাগনেসিয়াম
গ. পটাশিয়াম ঘ. আয়রন

উত্তর: আয়রন

২০। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে কত হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে? [রা. বো. ২৪]

ক. ৪- ১০ হাজার খ. ১০- ১৫ হাজার
গ. ২০-২৫ হাজার ঘ. ১৫-২০ হাজার

উত্তর: ৪- ১০ হাজার

২১। মনোসাইট নামক শ্বেত কণিকা কোন প্রক্রিয়ায় রোগ জীবাণু ধ্বংস করে? [সি. বো ২৩]

ক. ফ্যাগোসাইটোসিস খ. ফাইব্রিনোজেন
গ. অ্যান্টিবডি ঘ. থ্রোম্বোপ্লাস্টিন

উত্তর: ফ্যাগোসাইটোসিস

২২। ক্ষণ অবস্থায় কোথায় লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়? [য. বো. '২৪]

ক. যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় খ. যকৃৎ ও প্লীহা
গ. যকৃৎ ও লসিকা ঘ. যকৃৎ ও অস্থিমজ্জা

উত্তর: যকৃৎ ও প্লীহা

২৩। রক্তের অদ্রবণীয় প্রোটিন, যা দ্রুত সূতার মতো জাল তৈরি করে, তাকে কী বলে? [ঢা বো. ২২]

ক. নিউট্রোফিল খ. ফাইব্রিন
গ. বেসোফিল ঘ. থ্রম্বোসাইট

উত্তর: ফাইব্রিন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[সি.বো ২৪]

২৪। 'P' এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

ক. নিউক্লিয়াসবিহীন খ. আকারবিহীন
গ. হিমোগ্লোবিনবিহীন ঘ. কোষের ছিন্ন অংশ

উত্তর: নিউক্লিয়াসবিহীন

২৫। মানবদেহে তাপের সমতা রক্ষা করা কোনটির কাজ? [কু. বো. ২০]

ক. হরমোন খ. এনজাইম
গ. লসিকা ঘ. রক্ত

উত্তর: রক্ত

২৬। কোন গ্রুপের রক্ত সবাইকে দেওয়া যায়? [য. বো. ২৩]

ক. B-(ve) খ. AB+ (ve)
গ. O-(ve) ঘ. A-(ve)

উত্তর: গ. O-(ve)

২৭। কোন রক্ত গ্রুপকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়? [রা. বো.

২৪; য. বো. '২০]

ক. A খ. AB
গ. B ঘ. O

উত্তর: AB

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নাম	রক্তের গ্রুপ
রাতুল	A
তামিম	B
সোহাগ	AB
জিসান	O

[য.বো ২২]

২৮। সোহাগের রক্তের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

ক. a, b অ্যান্টিবডি আছে
খ. কোনো অ্যান্টিজেন নেই

গ. A, B অ্যান্টিজেন আছে

ঘ. শুধু অ্যান্টিজেন আছে

উত্তর: A, B অ্যান্টিজেন আছে

২৯। সার্বজনীন রক্তদাতা ও গ্রহীতার ধারণা অনুসারে-

- জিসান সোহাগকে রক্ত দিতে পারবে
- সোহাগ রাতুলের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে
- তামিম জিসানকে রক্ত দিতে পারবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: i, ii ও iii

৩০। উক্ত রক্তের বৈশিষ্ট্য হলো-

- লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ কম
- অ্যান্টিজেন আছে
- অ্যান্টিবডি নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ii ও iii

৩১। একজন সুস্থ ব্যক্তি কত মাস অন্তর রক্ত দিতে পারে? [চ.

বো. ১৫]

ক. এক

খ. দুই

গ. দুই

ঘ. চার

উত্তর: চার